POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 25

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 22 ই জুন, 2023 3 যুল হাজ্জা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মহানবী (সা.)-এর বাণী সুদ খাওয়ার নিন্দা এবং এর শাস্তি

২০৯৩) হযরত সাহার বিন সাআদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'এক মহিলা 'বুরদা' নিয়ে আসে। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বুরদা কি? তাঁকে বলা হয়, হ্যাঁ, ডোরাকাটা চাদর। সেই মহিলা বলল-'হে রসুলুল্লাহ্! আমি এটি নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরানোর জন্য। নবী (সা.) সেটি গ্রহণ করেন। এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি আমাদের কাছে সেই চাদর পরিহিত অবস্থায় আসেন। লোকেদের মধ্যে একজন বলে উঠল হে রসুলুল্লাহ! আমাকে এই চাদরটি পরার জন্য দিন। তিনি (সা.) বললেন- বেশ। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ মজলিসে বসে থাকলেন এরপর ভিতরে গিয়ে সেটিকে ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তাঁর এই চাদরটি চেয়ে ভাল কাজ করলে না। তুমি তো জানই যে কেউ চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। সেই ব্যক্তি বলল, খোদার কসম! আমি এটি এই কারণে চেয়েছি যাতে আমার মৃত্যুর পর এটি কাফন হয় । হযরত সাহাল (রা.) বলেন, সেই চাদরটিই তার কাফন হয়েছিল।

অসহায়দের প্রতি বিনম্র আচরণ করা।

২০৭০) হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে থেকে এক ব্যক্তির আত্মাকে যখন ফিরিশতারা অভ্যর্থনা জানালো তখন সে তারা বলল, তুমি কি কোন পুণ্য কর্ম করেছ? সে উত্তর দিল, আমি যুবকদেররকে অসহায়দের সময় ছাড় দেওয়ার এবং তাদের ক্ষমা করার আদেশ দিতাম। (হযরত হুযাইফা (রা.) বলতেন, নবী (সা.) বলেছেন) ফিরিশতারা তাকে ক্ষমা করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে বলল, আমি অসহায়দের প্রতি বিনম্র আচরণ করতাম আর অভাবীদেরকে ছাড় দিতাম।

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৫ মে ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২,
প্রশ্নোত্তর

যে ব্যক্তি আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার উদ্দেশ্যানুরূপ কাজ করে না, সে এক শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা সদৃশ। তাকে কর্তন করা ছাড়া মালির আর উপায় কি?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমি একজন পুস্তক রচনা করতে চলেছি, যার মধ্যে এমন লোকদের পৃথক করে দেওয়া হবে যারা নিজেদের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ছোট ছোট বিষয়ে বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। যেমন এক ব্যক্তি বলে, কোন বাজিগর দশ গজ লাফ দিয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই বিষয়টি নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়। এভাবে বিদ্বেষের জন্ম হয়। স্মরণ রেখো! বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়া মাহদীর লক্ষণ আর সেই লক্ষণ কি পূর্ণ হবে না? অবশ্যই হবে। তোমরা কেন ধৈর্য ধারণ কর না? যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে কিছু কিছু ব্যাধির ক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা নির্মূল হয়। আমার সত্তা থেকে এক পুণ্যবান জামাতের জন্ম হবে। ইনশাআল্লাহ॥ পারস্পরিক শত্রুতার কারণ কি? কার্পণ্য, আত্মশ্লাঘা, আত্মগর্ব এবং প্রবৃত্তির প্রণোদনা। যেমনটি আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমি খুব শীঘ্রই একটি পুস্তক রচনা করব এবং এমন সব লোকদের জামাত থেকে পৃথক করব যারা নিজেদের প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসকে দমিয়ে রাখতে পারে না আর পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সহকারে থাকতে পারে না। যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা দিনকয়েকের অতিথি মাত্র, যদি না উৎকৃষ্ট নমুনা প্রদর্শন করতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের কারণে আমার দিকে অভিযোগের তির নিক্ষিপ্ত হোক, তা আমি চাই না। যে ব্যক্তি আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার উদ্দেশ্যানুরূপ কাজ করে না, সে এক শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা সদৃশ। তাকে কর্তন করা ছাড়া মালির আর উপায় কি? শুষ্ক শাখা অন্যান্য সতেজ শাখার সঙ্গে জুড়ে থেকে পানি শুষে নেয় ঠিকই, কিন্তু তাতে সে সতেজ হয় না। বরং অন্যান্য ডালপালাগুলিকেও শুকিয়ে দেয়। অতএব, ভীত হও। আমার সঙ্গে এমন ব্যক্তি থাকবে না, যে- নিজের চিকিৎসা করাবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৮)

কুরআন করীমের এটা এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব; কুরআন মানুষকে কেবল পাপ থেকেই প্রতিহত করে না, বরং পাপ প্রতিহত করার পন্থাও বলে দেয় আর এমন শিক্ষাই মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে। যে ধর্মগ্রন্থ পাপ থেকে রক্ষার পাওয়া উপায় বলে দিতে পারে না, তা মানুষকে সমস্যায় জর্জরিত করে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাইলের ৩৩ নং আয়াত

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

এই আয়াতে সন্তানকে হত্যার বিষয়ে উল্লেখ করার পর ব্যাভিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার আদেশ করা হয়েছে। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারের দ্বারাও সন্তানকে হত্যা করা হয়। কেননা, প্রথম অবৈধ সন্তানকে সাধারণত নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়ত, যদি নষ্ট না-ও হয়, তবে পুরুষ প্রকাশ্যে সেই সন্তানের লালনপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে অংশ নিতে পারবে না। আর সচরাচর এমন সন্তান অভিভাবক ও ওয়ারিস ছাড়া ধ্বংস হয়ে যায়।

لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্যাভিচারের সুযোগ তৈরীই হতে দিও না। অর্থাৎ 'নামাহরম মহিলাদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করো না, তাদের সঙ্গে বেশি খোলামেলা আচরণ করো না ইত্যাদি ইত্যাদি। কুরআন করীমের এটা এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব; কুরআন মানুষকে কেবল পাপ থেকেই প্রতিহত করে না, বরং পাপ প্রতিহত করার পন্থাও বলে দেয় আর এমন শিক্ষাই মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে। যে ধর্মগ্রন্থ পাপ থেকে রক্ষার পাওয়া উপায় বলে দিতে পারে না, তা মানুষকে সমস্যায় জর্জরিত করে। সেই গ্রন্থই মনের মধ্যে প্রশান্তি এনে দিতে পারে যা কোন কিছু নিষেধ করার পাশাপাশি তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও বলে দেয়, যাতে মানুষ সেই আদেশ পালনের বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারে। ইঞ্জিল শিক্ষা দেয়, তোমরা কোন মহিলার প্রতি কুদৃষ্টি দিও না। অপরদিকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তোমরা কোন নামাহরম মহিলার দৃষ্টিপাতই করবে না। কেননা, যে আকর্ষণ মানুষের মনের মধ্যে তোলপাড় করে, যখন তার জন্য পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সামলানো অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এই প্রজ্ঞা মেনে এখানে বলা হয়েছে, তোমরা পাপের স্থান থেকে এতটা তফাতে দাঁড়াও যেখান থেকে তোমরা মন্দের মোকাবিলা করতে পার। অনেকে বলেছে, এটা তো কাপুরুষতা, কিন্তু এটা কাপুরুষতা নয়, বরং সতর্কতা অবলম্বন। সতর্কতা অবলম্বনকে নিশ্চয় কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাপুরুষতা বলে না।

স্পষ্টই মানুষ দুই প্রকারেরই হতে পারে। প্রথমত, যারা পাপের কাছে গিয়েও তা এড়িয়ে চলতে পারে। এমন ব্যক্তিকে পাপ থেকে দূরে থাকার উপর গুরুত্ব এজন্য দেয় যে, যদিও পাপ এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু তাকে দেখে অন্যরাও সেই সীমা পর্যন্ত চলে যাওয়ার সম্ভবানা রয়েছে।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আমি ভবিষ্যত পৃথিবীর মানুষদের, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের বলছি যে, তাদের নিজেদেরকে পাল্টাতে হবে, পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং নিজেদের স্রষ্টার অধিকার প্রদান করতে হবে এবং আমাদের সঙ্গে বসবাসকারী সহনাগরিকদেরকেও। অন্যথায় কি হতে চলেছে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর যা কিছু দেখা যাচ্ছে তা শুধুই অন্ধকার এবং এই পৃথিবীর অন্ধকারময় পরিণতি।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া নর্থ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এর ১৬-১৯ বছরের খুদ্দামদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া নর্থ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এর ১৬-১৯ বছরের খুদ্দামদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) -এর এ.টি.এ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। ওয়াকফে নও খুদ্দামরা Manchester এর দারুল আমান মসজিদ থেকে থেকে অন লাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের যোগদান করেন।কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ওয়াকফে নও খুদ্দামরা হুযুর আনোয়ারের কাছে নিজেদের প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে, 'হুযুর আপনি যখন তাহাজ্জুদ পড়েন তখন কোন দোয়াগুলি পাঠ করেন এবং কোন পর্যায়ক্রমে তা পাঠ করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আসি নিজের জন্য এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন যাতে আমি আরো বেশি খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারি। এরপর আমি জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়া করি, এরপর বন্ধুদের জন্য এবং সন্তানসন্ততিদের জন্য দোয়া করি। এইভাবে আপনাদেরও নিজেদের জন্য দোয়া করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.) এর মিশনের জন্য দোয়া করা উচিত যে, ইসলামের বাণী যেন দ্রুত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌছে যায়। এরপর নিজ ভাই-বোনদের জন্য, পিতামাতার জন্য এবং অন্যদের জন্য দোয়া করা উচিত। এটা তো সাধারণ একটা ক্রম, কিন্তু অনেক সময় কোনও ঘটনা ঘটে গেলে আমি তার জন্যও দোয়া করি।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার ঘানায় থাকাকালীন ভ্রমণ ও ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য কি করতেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ক্রীড়াকৌতুকের জন্য সময় থাকত না। যদিও যে সময়টুকু আমি সেখানে কাটিয়েছি, বসে থেকে হোক বা দাঁড়িয়ে থেকে, চলাফেরা করে হোক বা কাজ করে, সবই ছিল আমার জন্য উপভোগের বিষয়। আমি সেখানে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। এখানে যে সব জিনিস আপনারা পেয়ে থাকেন, সেখানে সেসব পাওয়া যেত না। আমাদের কাছে টেলিভিশন ছিল না, রেডিও ছিল না, অধিকাংশ সময় আমাদের সেখানে বিদ্যুত থাকত না। তাই যা কিছু আমি বিনোদন হিসেবে করতে পারতাম সেটা এই যে, কাজ থেকে ফিরে এসে পরিবারকে সময় দিতাম এবং বই পড়ে সময় কাটাতাম।

প্রশ্ন: কুরআন করীম শহীদদেরকে কেন জীবিত আখ্যায়িত করেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কেননা, তারা আল্লাহ্‌র পথের শহীদ হয়েছে আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তারা জীবিত থাকবে। আর তারা এর প্রতিদান পাবে জান্নাতে। শহীদরা যেহেতু আল্লাহ্‌র ধর্মের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাই ইহজগতেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন। এমনকি সাধারণ মানুষও তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের পদমর্যাদা উন্নত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। সেই কারণে আপনি সব সময় তাদের স্মরণ রাখেন। আর তাদের স্মৃতি থেকে তাদের পরিবারই আনন্দিত হয় না, বরং অন্যরাও হয়। এই কারণে খোদা তা'লা বলেছেন, তারা জীবিত এবং তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কেননা, মৃত তারা যাদেরকে কেউ জানে না। আর মৃত্যুর পর তার নিকটাত্মীয়রা ছাড়া কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না। আর শহীদদেরকে সব সময় স্মরণ রাখা হয়।

আর জান্নাতেও তাদেরকে অন্যদের তুলনায় উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেওয়া হবে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, তোমরা তাদেরকে ইহজগতে মৃত মনে কর ঠিকই, কিন্তু জান্নাতে এক সুন্দর জীবন অতিবাহিত করছে। আর সেটিই তোমাদের শেষ গন্তব্য।

আর এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, জামাত আহমদীয়া মুসলেমার উপর অত্যাচার ও নির্যাতন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, যখন কি না পশ্চিমের একাধিক দেশে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যখন আহমদীয়া জামাত পশ্চিমের দেশগুলিতে প্রসার লাভ করবে বা সেই সব ধনী দেশসমূহে আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়বে, যাদের থেকে পাকিস্তান বা অন্যান্য কিছু দরিদ্র দেশ সহায়তা বা অনুদান গ্রহণ করে, তখন আহমদী মুসলমানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও বর্বরতা থেকে বিরত থাকতে হবে। খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যতদিন পর্যন্ত রোমান সম্রাট খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নি। তার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর খৃষ্টানদের উপর হওয়া যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার ও বর্বরতা বন্ধ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে পাকিস্তান হোক অন্য কোন মুসলিম দেশ, সেখানকার মুসলমানরা যদি পশ্চিমি দেশগুলির মুসলমানদের পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ না করে, তবে তাদেরকে (অত্যাচার করা থেকে) নিবৃত্ত হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, এই মুহূর্তেও মুসলমান দেশগুলির অধিকাংশ যারা আহমদীদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে, তারা এখনও এই সব পশ্চিমি দেশগুলির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যতদিন পর্যন্ত তারা এই সব দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে তাদেরকে এই সব দেশের কথা মেনে চলতে হবে। তাদের খোদা এক-অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান নন।

যদিও তারা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান আনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের খোদা হল এই সব পশ্চিমি দেশগুলি যাদেরকে এরা অনুসরণ করে থাকে।

স্কটল্যাণ্ডের একজন খাদিম প্রশ্ন করে, 'হুযুর! স্কটল্যাণ্ড এর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হওয়ার বিষয়ে হুযুরের মতামত কি? আর হুযুরের নিকট স্কটল্যান্ডের প্রিয় স্থান কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি কোন রাজনীতিবিদ নই। তবে আমার মতে বর্তমান যুগে স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ড-এর শান্তি ও নিরাপত্তা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার মধ্যেই নিহিত, যাতে এক পতাকা তলে সকলে সম্মিলিত ভাবে থাকতে পারে। এটাই সব থেকে ভাল হবে।

স্কটল্যাণ্ডে নিজের প্রিয় স্থানের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, স্কটল্যাণ্ড- এর পার্বত্যাঞ্চলে পোর্টনেলান নামে একটি স্থান আছে যেখানে আমি গিয়েছিলাম এবং কয়েকদিন সেখানে ছিলাম। এই জায়গাটি আমার পছন্দ। এছাড়া সেখানে পিটলোচরি (শহর) রয়েছে, যেটি নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে নৌকা বাঁধা থাকে। আর একটি প্রিয় স্থান হল ফাকরিক হুইল। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। স্কটল্যান্ড একটি সুন্দর জায়গা, সেখানে যে সব জায়গা আমি গেছি সেগুলি সবই সুন্দর।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, হুযুর! আপনার বয়স যখন আমাদের মত ১৬-১৯ বছর ছিল, তখন আপনি কি কি করতেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার মনেই নেই সেই সময় আমার কোন কাজ ছিল কি না। আমি সেই সময় ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলতাম। আর আমার মনে আছে, কিছু সময় ধরে আমি পুরোনো টিকিট সংগ্রহ করে রাখতাম-ডাকটিকিট। কিন্তু এটা কোন কাজ নয়, মাঝে মধ্যে এই কাজটা করতাম। তাই বলতে গেলে আমার নির্দিষ্ট কোন শখ ছিল না। আমি খেলতাম খেলা হিসেবে, সেই খেলায় কোনও কিছু অর্জন করার জন্য কখন খেলি নি।

একজন ছাত্র হুযুর আনোয়ারের কাছে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্বত্রই আপনারা দেখছেন অন্যায় অত্যাচার, বর্বরতা ও রক্তপাত- সেটা বৃহত শক্তির পক্ষ থেকে দরিদ্র দেশগুলির উপর হোক বা দেশের অভ্যন্তরে হোক বা ছোট দেশগুলির মাঝে। সর্বত্র অরাজকতা ছড়িয়ে আছে। আমাদেরকে তাদের বলতে হবে যে তাদের কর্তব্য কি? (হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ)। এটা আহমদী মুসলমানদের কর্তব্য আর আমাদের কাঁধে একটি বিরাট দায়িত্ব। তাই আমি ভবিষ্যত পৃথিবীর মানুষদের, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের বলছি যে, তাদের নিজেদেরকে পাল্টাতে হবে, পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং নিজেদের স্রষ্টার অধিকার প্রদান করতে হবে এবং আমাদের সঙ্গে বসবাসকারী সহনাগরিকদেরকেও। অন্যথায় কি হতে চলেছে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর যা কিছু দেখা যাচ্ছে তা শুধুই অন্ধকার এবং এই পৃথিবীর অন্ধকারময় পরিণতি।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমাদের আচরণ যেন এমন হয় যার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র থাকে না। (মসীহ মওউদ)

একজন মোমেন নিজ ঈমানকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মেনে চলবে-প্রকৃত মোমেনের এটাই লক্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতের এমন তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ তফসীর বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা খোদা তা'লার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, যা একজন মোমেনকে ঈমান ও বিশ্বাসের নতুন এক গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মান্যকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের সংশোধন করা এবং জগতের সংশোধন করারও চেষ্টা করা।

"এমন পবিত্র শিক্ষা তওরাতেও নেই ইঞ্জিলেও নেই, আমি এর প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ে দেখেছি। কিন্তু এমন পবিত্র ও পরিপূর্ণ শিক্ষার নামচিহ্ন পর্যন্ত নেই।"

হযরত মসীহ মওউদ এর লেখনীর আলোকে সূরা নহল-এর ৯১ নম্বর আয়াতের বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ, অর্থাৎ-ন্যায় বিচার, অনুগ্রহ এবং 'ঈতাজিল কুরবা' (নিকটাত্মীয়দের প্রতি বদান্যতা) সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ আলোচনা।

পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ মে, ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (৫ হিজরত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূ রা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل:91)

(সূরা নাহল: ৯১) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের এবং অনাত্মীয়দেরও নিকটাত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান করেন আর সকল প্রকার নির্লজ্জতা ও অপন্দনীয় বিষয় আর বিদ্রোহ থেকে বারণ করেন। তিনি তোমাদের নসীহত করেন যেন তোমরা বুঝতে পারো।

এই আয়াতটি প্রত্যেক জুমুআ ও দুই ঈদের সানী খুতবায়ও পাঠ করা হয়। এতে কিছু নেকী বা পুণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর (কিছু) মন্দ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা'লা বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে নিজ ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নির্দেশ ও নসীহতসমূহ মেনে চলে, নতুবা সেই মর্যাদা লাভ হয় না যা এক মুসলিমকে প্রকৃত মু'মিন বানায়।

এই আয়াতে যেসব নেকী বা পুণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ এবং আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করা- সেগুলো সম্পর্কে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করব যা তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সভায় বর্ণনা করেছেন।

প্রতিটি নির্দেশ না যদিও একই কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু বিভিন্নভাবে নসীহত করা হয়েছে যেগুলো আমাদেরকে আমাদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী অতিবাহিত করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তিনি শুধু মানুষের সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই এসব বৈশিষ্ট্য ও পুণ্যের কথা বলেন নি, বরং ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহারের সম্পর্ক খোদা তা'লার সাথেও বজায় রাখা যায় তা-ও বলেছেন।

তিনি এর এমন তত্ত্ব জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন যার দ্বারা প্রকৃত অর্থে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের পরিচয় লাভ হয়, যা এক মু'মিনকে ঈমান ও বিশ্বাসের নতুন সব লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

যাহোক এখন আমি কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, এগুলো সম্পর্কে মানুষ যদি প্রণিধান করে আর (এগুলোকে) নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা এমন এক কর্মপন্থা লাভ করি যা বাস্তব অর্থে আমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করে আর অপরের অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এভাবে এমন এক চমৎকার সমাজও প্রতিষ্ঠা করে যা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানকারী সমাজ হয়ে থাকে। আর এটিই সেই জিনিস যা সমাজেরও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং জগতের নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা প্রদানকারী। কিন্তু পরিতাপ যে, জগতের অধিকাংশ লোক একে অপরের অধিকার হরণের চেষ্টায় রত, তা মুসলিম বিশ্ব হোক বা অমুসলিম বিশ্ব। মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নামে অন্যায় ও অত্যাচারে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমতাবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদেরও সংশোধন করা এবং জগদ্বাসীরও সংশোধনের চেষ্টা করা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের জন্য খোদার নির্দেশ হলো, তোমরা তাঁর সাথে এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায়বিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার প্রদান করো। আর যদি এরও অধিক সম্ভব হয় তাহলে শুধু ন্যায়বিচারই নয়, বরং অনুগ্রহ করো। অর্থাৎ ফরয বা অবশ্য পালনীয় দায়িত্বাবলীর চেয়ে অধিক করো, আর এমন নিষ্ঠার সাথে খোদার ইবাদত করো যেন তোমরা তঁাকে দেখতে পাচ্ছো। (প্রথমে বান্দার অধিকার সম্পর্কে বলেন, এরপর বলেন যে, খোদার ইবাদতও এমনভাবে করো যেন তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো।) আর মানুষের সাথে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে অধিক দয়ার্দ্র আচরণ করো। আর যদি এর চেয়েও অধিক সম্ভব হয় তাহলে এতটা নিঃস্বার্থ হয়ে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে গিয়ে) কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই খোদার ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা করো। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতও নিঃস্বার্থভাবে করো, কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে যাবে না। আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবাও নিঃস্বার্থভাবে করো যেমনটি কেউ আত্মীয়তার প্রেরণায় করে থাকে।"

(শাহনায়ে হক, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬১-৩৬২)

এরপর উক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি (আ.) আরও বিস্তারিতভাবে বলেছেন। বান্দাদের অধিকার কীভাবে প্রদান করতে হবে তা-ও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমত এই আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখো, অন্যায়কারী হয়ো না। সর্বদা এর

প্রতি দৃষ্টি রাখো, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করো। অতএব যেভাবে প্র কৃত অর্থেই তিনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, কেউই ভালোবাসা লাভের যোগ্য নয়, কেউই ভরসার যোগ্য নয়; কেননা সৃষ্টি করা, চিরস্থায়ী হওয়া ও স্থায়িত্বদান এবং প্রতিপালনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সকল প্রকারের অধিকার তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ন্যায়বিচার করার অর্থ কী? (এর অর্থ হলো) আল্লাহ্ তা'লার সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আর আনুগত্যের সম্পর্ক এজন্য রাখতে হবে কেননা তিনিআমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি চিরস্থায়ী এবং তিনিই স্থায়িত্ব দানকারী। প্রতিপালনের ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি প্রতিপালক, প্রতিপালনকারী। আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণকারী। তাই ভরসাস্থল ও ভালোবাসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। অনুরূপভাবে তোমরাও তাঁর ইবাদতে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এবং তাঁর প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যে তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার কোরো না। যদিতোমরা এতটুকু করো তবে এটিই হলো ন্যায়বিচার যার প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমাদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে আদল বা ন্যায়বিচার করা। এতটুকু করা আবশ্যক। এরপর যদি এক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাও, পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে চাও, তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে এহসান বা অনুগ্রহ। আর তা হলো, তোমরা তাঁর মাহাত্ম্যে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং ইবাদতে তাঁর সামনে এমনভাবে সশ্রদ্ধ হও এবং তাঁর ভালোবাসায় এরূপ বিভোর হয়ে যাও যেন তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ এবং তাঁর অম্লান সৌন্দর্য অবলোকন করেছো। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে, অনুগ্রহ করা; আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তো অনুগ্রহ করা যায় না, কিন্তু এখানে এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ নিমগ্নচিত্ত হয়ে যাও যেন তুমি তাঁর মাহাত্ম্যকেও অবলোকন করেছো, তাঁর প্রতাপকেও অবলোকন করেছো এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছো, তাঁর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছো। অতঃপর বলেন, এরপর রয়েছে নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহারের পর্যায়, আর তোমার ইবাদত, তোমার ভালোবাসা এবং তোমার আনুগত্যথেকে যেন লোকদেখানো ও কৃত্রিমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় হতে পারে,অনুগ্রহস্বরূপ তুমি যা করছো অর্থাৎ যে চেষ্টা করছো তাতে কিছুটা কৃত্রিমতা থাকতে পারে; কিছুটাকৃত্রিমতা করতে হয় বা চেষ্টা করতে হয়; কিন্তু এমন অবস্থায় উন্নীত হও যেন কৃত্রিমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। এক আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তুমি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী হও এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনকারী বান্দায় পরিণত হয়ে যাও এবং তুমি তাঁকে সেরূপ আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করো যেভাবে উদাহরণস্বরূপ তোমরা তোমাদের পিতাদের স্মরণ করে থাকো,এবং তাঁর প্রতি তোমাদের ভালোবাসা যেন এরূপ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেরূপ এক শিশু তার প্রিয় মাকে ভালোবাসে।"

এরপর বলেন, "দ্বিতীয়ত বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রে যে সহমর্মিতা মানবজাতির প্রতি প্রদর্শন করতে হবে সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতের অর্থ হলো, নিজ ভাই ও মানবজাতির প্রতি ন্যায়বিচার করো এবং নিজ প্রাপ্য থেকে অধিক আদায় করার চেষ্টা কোরো না এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো। যতটুকু তোমার অধিকার রয়েছে তা অবশ্যই তাদের কাছে চাও, কিন্তু ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। অন্যায্য দাবি-দাওয়া যেন না করা হয়। আর যদি এ পর্যায় থেকে উন্নতি করতে চাও তাহলে এর পরে রয়েছে এহসান বা অনুগ্রহের স্তর আর তা হলো, তুমি নিজের ভাইয়ের মন্দের বিপরীতে পুণ্য করবে।"

যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ (আচরণ) করে তাহলে তার সাথে সদ্ব্যবহার করো, এটিই হলো এহসান। আর তার (দেয়া) কষ্টের বিনিময়ে তাকে আরাম দাও। যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয় তাহলে তুমি তার আরামের ব্যবস্থা করো, তাকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করো এবং দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ তার হাতে হাত দাও। এরপরের ধাপ হলো ঈতায়ি যিল-কুরবা'র আর তা হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি যতটুকু পুণ্য করবে অথবা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করবে সেক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার অনুগ্রহ লাভ করা উদ্দেশ্য না হয়।"

এর অর্থ কোনোরূপ অনুগ্রহ যেন না হয়, বরং কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না করে স্বভাবজাতভাবেই যেন তা তোমার দ্বারা সম্পাদিত হয়। (এমন কাজ করো যা স্বভাবজভাবে হয়ে থাকে)। যেভাবে নৈকট্যের টানে উদ্বেলিত হয়ে এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। (এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাথে, এক আপনজন অন্য আপনজনের সাথে পুণ্য করে থাকে। কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করবে)। অতএব এটি নৈতিক উন্নতির চূড়ান্ত স্তর, যেখানে সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রবৃত্তির চাহিদা, স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকে না, বরং ভ্রাতৃত্ব ও মানব প্রেমের প্রেরণা এরূপ উন্নত স্তরে এসে উপনীত হয় যেখানে আপনা-আপনি, সবরকম কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে থেকে এবং কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রেখে, কোনোরূপ কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করে (অর্থাৎ, কোনো প্রত্যাশা না রেখে, কোনো ধরনের কৃতজ্ঞতার আশা না করে কিংবা দোয়া অথবা অন্য কোনো প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রেখে) সেই পুণ্য যেন কেবলমাত্র স্বভাবজাত উদ্দীপনায় সম্পাদিত হয়।"

(ইযালায়ে আওহাম, দ্বিতীয় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫০-৫৫২)

কেউ তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, অথবা তোমার জন্য দোয়া করবে অথবা কারো কাছে অন্য কোনো পুণ্যের বাসনা থাকবে- এমনটি হওয়া উচিত নয়। কোনো ধরনের প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে তার সাথে নৈকট্যের সম্পর্কের কারণে এই কাজ করা উচিত)। অতএব এটি সেই আচরণ যা সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সাথে করা উচিত। এরপর এর গণ্ডি আরো বিস্তৃত করে অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছানো উচিত।

এরপর হুকূকুল্লাহ্‌র বরাতে তিনি (আ.) আরো বলেন, হাক্কুল্লাহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতের অর্থ হলো, ন্যায়পরায়ণতার সাথে খোদা তা'লার আনুগত্য করো। কেননা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে লালনপালন করেছেন এবং প্রতিনিয়ত করছেন; তাঁর প্রাপ্য অধিকার হলো, তুমিও তাঁর আনুগত্য করবে। (আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালনপালন করেছেন, প্রতিপালন করছেন, জাগতিক উপকরণাদি সরবরাহ করছেন, তুমি তাঁর আনুগত্য করবে- এটি তাঁর অধিকার; তাই তাঁর আনুগত্য করো।) আর যদি তোমার অন্তর্দৃষ্টি এর চেয়েও প্রখর হয় তাহলে কেবলমাত্র অধিকার প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং এহসানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করো। প্রথম পর্যায় হলো আদল বা ন্যায়বিচার, অর্থাৎ মনে রাখবে যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করছেন (তাই) আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। বরং এর চেয়েও অগ্রগামী হয়ে এহসানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করো কেননা তিনি মুহসিন বা এহসানকারী, আর তাঁর অনুগ্রহ এত বেশি যে, গণনা করে শেষ করা যায় না। (আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করা আরম্ভ করো, এরপর তাঁর আনুগত্য করো। অতএব এটি হলো এহসান বা অনুগ্রহের মান বা মর্যাদা। আর এটি জানা কথা যে, আদলের স্তর থেকে উন্নত স্তর সেটি, যেখানে আনুগত্যের সময় এহসানও যেন দৃষ্টিপটে থাকে। আর যেহেতু সবসময় অনুগ্রাহীর বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ তার চেহারাকে সামনে নিয়ে আসে, তাই এহসানের সংজ্ঞায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত যে, সে এমনভাবে ইবাদত করে যেন খোদা তা'লাকে চাক্ষুস দেখছে।"

কাজেই, এটি হলো খোদার প্রতি এহসান এর বৈশিষ্ট্য হলো। আল্লাহ তা'লার প্রতি তো (কেউ) এহসান করতে পারে না, (বরং মানুষের প্রতি) আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ করা মানুষকে এহসানকারী বানায়। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করার জন্য যে রীতি তিনি (আ.) বলেছেন তা হলো, তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ বা অনুকম্পা করে তার চেহারা ও তার বৈশিষ্ট্য তোমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর তা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন তোমার একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'লার সাথে যখন এই সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখন তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করবে, আর সেই ইবাদত এমন হবে, তোমাদের মন-মস্তিষ্কে এমন ভাবনার উদয় হবে যে, তোমরা যেন খোদা তা'লাকে দেখছো।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যকারীরা মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ তারা যারা পর্দাচ্ছন্ন থাকায় এবং উপকরণের ওপর নির্ভরতার কারণে খোদা তা'লার অনুগ্রহকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করে না। (তাদের অন্তরে পর্দা রয়েছে অথবা উপকরণের ওপর অত্যধিক নির্ভর করার কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিকে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে পারে না, বুঝতে পারে না। যেহেতু জানে না তাই অনুরাগও সৃষ্টি হয় না, যা অনুগ্রহের মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টিপাতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।) তাদের মাঝে সেই ভালোবাসা উদ্বেলিত হয় না যা অনুগ্রাহীর মহান বদান্যতার কথা চিন্তা করে উদ্বেলিত হয়ে থাকে। [আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে যতক্ষণ সঠিক ধারণাই সৃষ্টি না হবে এবং তাঁর অবয়বই দৃষ্টির সামনে ভেসে না উঠবে, তাঁর অনুগ্রহের কথাই মাথায় না আসবে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত (বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য) সম্পর্কে মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করলে সেই উদ্দীপনাও সৃষ্টি হতে পারে না।] তিনি (আ.) বলেন, অর্থাৎ হৃদয়ের সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে না যা একজন অনুগ্রহকারীর কৃপারাজিকে কল্পনা বা স্মরণ করে হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে, বরং শুধুমাত্র ভাসাভাসা দৃষ্টিতে খোদা তা'লার স্রষ্টা হওয়া ইত্যাদি বিষয় স্বীকার করে নেয়। (এমন লোকেরা সামগ্রিকভাবে, এক প্রকার ভাসাভাসা দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকর্তা হবার বিষয়টি মেনে নেয় যে, হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'লা হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু এর গভীরতার জ্ঞান তারা রাখে না।) আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বিশদ দিকগুলো, যেগুলির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত সেই সত্যিকার অনুগ্রাহীকে দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে, তা (তারা) কখনোই প্রত্যক্ষ করে না। গভীরভারে এটি পর্যালোচনা করে না যে, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ তা'লার যে অধিকার রয়েছে তা আমাদের কাছে কী দাবি করে। গভীরভাবে এটি অধ্যয়ন করে না, কেননা উপকরণপূজার ধুলোবালি সব কারণের মূল কারণ তথা খোদার চেহারা দর্শনের ক্ষেত্রে বাধ সাধে। (জাগতিক উপকরণাদির ধুলোময়লা, এর ধুলোবালি তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, যে কারণে তারা

আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার চেহারা দেখতে পায় না।) এ কারণে তাদের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় না যা দিয়ে পূর্ণরূপে প্রকৃত দানকারীর সৌন্দর্যকে (তারা) পরিপূর্ণরূপে দর্শন করতে পারে। (অর্থাৎ যিনি প্রকৃত দাতা তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সৌভাগ্য তাদের হয় না; এরূপ দৃষ্টিশক্তি তাদের নেই।) তাদের দুর্বল তত্ত্বজ্ঞান, উপকরণের ওপর নির্ভরশীলতার কলু ষের সাথে একাকার হয়ে বিরাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে তাদের যতটুকু তত্ত্বজ্ঞান আছে, যৎসামান্য যে জ্ঞান আছে, সে কারণে তারা কখনো নামায পড়ে আবার কখনো নামায পড়ে না। কখনো অধিকার প্রদান করে আবার কখনো করে না; এর সাথে উপকরণের কলুষতার মিশ্রণ থাকে। জাগতিক বস্তুসমূহ, পার্থিব উপকরণ ও জাগতিক কামনা-বাসনা অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার চেহারা যথার্থরূপে দেখতে পারে না। আর এছাড়া তারা নিজেরাও যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি সঠিকভাবে দেখতে পায় না তাই এর প্রতি তারা মনোযোগী হয় না, যা অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করার সময়ে করতে হয়। সে দিকে তাদের পুরো মনোযোগ নেই যার ফলে অনুগ্রাহীর চেহারা সামনে এসে যায়, বরং তাদের অন্তর্দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে থাকে, বরং সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ্ তা'লার চেহারা স্পষ্টরূপে দেখতেই পায় না। কারণ হলো, তারা কিছুটা নিজেদের পরিশ্রম ও উপকরণের ওপর ভরসা করে আর কিছুটা বাহ্যিকতাস্বরূপ এ-ও বিশ্বাসকরে যে, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হবার কারণে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান আমাদের জন্য অপরিহার্য। তারা স্পষ্টভাবে জানেই না। তাদের কিছুটা ভরসা থাকে যে, আমরা এ কাজ করেছি এবং আমাদের এই জ্ঞান ছিল তাই আমাদের এ কাজটা হয়ে গেছে; (এর প্রতি ভরসা থাকে)। এছাড়া ধর্মীয় পরিবেশে থাকার কারণে তাদের ওপর ধর্মেরও কিছু না কিছু প্রভাব পড়ে থাকে তাই স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার যে অধিকার রয়েছে- আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, আমাদের প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা-ও মাথায় থাকে। মোটকথা (একপ্রকার) মিশ্র অবস্থা তাদের (মস্তিষ্কে) বিরাজ করে। এই মিশ্র অবস্থায় সে সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার চেহারা দেখতে পায় না এবং খোদা তা'লা যেহেতু মানু ষের ওপর তার বোধবুদ্ধির বাইরে দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না, তাই যতদিন তারা এ অবস্থায় থাকে তাদের কাছে ন্যূনতম এটিই প্রত্যাশা করেন যে, (তারা যেন) তাঁর প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর আয়াত إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ - এই আয়াতে আদল দ্বারা মানু ষের ন্যায়সঙ্গতআনুগত্যকে বুঝায়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত কার্যকর হয়। এমন লোক যারা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার চেহারা দেখতে পায় না, তাদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লা দয়ার আচরণ করেন এবং তাদের সেই (দুর্বল অবস্থাকেও) গ্রহণ করেন। [এটি তো ন্যায়পরায়ণতা, এটি মৌলিক বিষয়; এক মুসলমানের সর্বনিম্ন মান।] তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু মানুষের এর চেয়ে উন্নত মা'রেফাত (তথা আল্লাহ্র পরিচয় লাভ) হলো, আমি যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করেছি, মানুষের দৃষ্টি উপায়-উপকরণের (কলুষতা) থেকে একেবারেই পবিত্র এবং পরিষ্কার হয়ে খোদা তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহের হাত দেখতে পায়। কেবল এই জাগতিক উপায়-উপকরণের ওপর আস্থা রাখে না, বরং মানুষ যখন উন্নতি করে পরের স্তরে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে দেখতে পায়। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার ওপর আস্থা সৃষ্টি হয়, তাঁর পরিচয় লাভ হয়। এই স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষ উপায়-উপকরণের (কলু ষিত) আবরণ থেকে একেবারেই বাইরে বেরিয়ে আসে। [জাগতিক উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে না বরং পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র ওপর আস্থা রাখে।] আর 'আমার পানি সিঞ্চনেই আমার ফসল হয়েছে' অথবা 'আমার বাহুবলে আমি সফলতা লাভ করেছি', অথবা 'যায়েদের অনুগ্রহে অমুক উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে' আর 'বকরের দেখভালের ফলে আমি ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছি'- এসব উক্তি বা কথা তুচ্ছ এবং মিথ্যা প্রতিভাত হতে থাকে। নিজের কোনো গুণ বা চেষ্টার ওপর নির্ভরতা থাকে না, আর অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতা এবং গুণের ওপর নির্ভরতাওথাকে না। এ সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় আর একটিমাত্র সত্তা, একজন সর্বশক্তিমান ও একজন অনুগ্রহকারী বরং একটি হাতই দৃষ্টিগোচর হয়। তখন মানুষ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি দেখতে পায় যার সাথে এক অণু পরিমাণও উপকরণরূপী শিরকের কলুষতা থাকে না।

[আল্লাহ্ তা'লা যখন এভাবে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহকে মানুষ দেখতে পায়।] আর সেই দর্শন এমন স্বচ্ছ এবং সুনিশ্চিত হয় যে, সে এমন অনুগ্রহকারীর ইবাদত করার সময় তাঁকে অদৃশ্য মনে করে না, বরং অবশ্যই তাঁকে উপস্থিত মনে করে তাঁর ইবাদত করে। [এরপর মানুষ যখন ইবাদত করে বা নামায পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'লাকে নিজের সামনে উপস্থিত মনে করে।] আর পবিত্র কুরআনে এই ইবাদতের নাম রাখা হয়েছে এহসান [অর্থাৎ যেন খোদার প্রতি অনুগ্রহ। [আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে এমনভাবে সিজদাবনত হওয়া যেন আল্লাহ্ সামনেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন এটিকে এহসান বলে]। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে স্বয়ং মহানবী (সা.) এহসানের এই অর্থই করেছেন।"

এখানেই কথা শেষ হয়ে যায় নি , বরং তিনি (আ.) আরো বলেন,] এই স্তরে উন্নীত হওয়ার পর আরেকটি স্তর রয়েছে যার নাম 'ঈতায়ি যিল-কুরবা' আর এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যখন একটা সময় পর্যন্ত ঐশী অনুগ্রহরাজীকে সকল প্রকার উপায়-উপকরণরূপী শিরক হতে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, [যেমন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ জাগতিক কোনো উপায়-উপকরণে কলুষিত না করে দেখতে থাকে, কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রতি শতভাগ আস্থা রাখে এবং তাঁকে উপস্থিত এবং প্রত্যক্ষ অনুগ্রহকারী জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত করতে থাকে তখন এই প্রত্যয় ও চিন্তাধারার চূড়ান্ত ফলাফল যা প্রকাশ পাবে তা হলো, আল্লাহ্র সাথে তার এক ব্যক্তিগত ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। [আল্লাহ্র সাথে তার এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হবে] যার মাঝে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ থাকবে না। কোনো জিনিস নিজ ব্যক্তিগত চাহিদার কারণে যাচনা করবে না। বরং একপ্রকার ব্যক্তিগত ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, কেননা খোদার অব্যাহত অনুগ্রহরাজী স্থায়ীভাবে প্রত্যক্ষ করা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে এই প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সেই ব্যক্তির ভালোবাসা ধীরে ধীরে তার মাঝে সৃষ্টি হয়। [যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছে এবং ক্রমাগত অনুগ্রহের উপলব্ধি ও তা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ এটি দেখতে থাকা যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে অনুগ্রহ করছেন- সেই (অনুগ্রহের) উপলব্ধি ও জ্ঞান যখন তার লাভ হয়, তখন কী হয়? এর ফলে তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যক্তিগত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা এটি চিরন্তন রীতি, যদি এ ধরনের সম্পর্ক থাকে তাহলে তার প্রতি এক ব্যক্তিগত ভালোবাসায় মন ভরে যায়;] যার অফুরন্ত অনুগ্রহরাজি তাকে ঘিরে রেখেছে। এমতাবস্থায় সে কেবল তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা তার হৃদয়ে বাসা বাঁধে। [প্রথমে কোনো কিছু চাওয়ার জন্য ইবাদত, এরপর আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছু জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত- এটি হলো এহসানের রঙে রঙিন ও উপলব্ধি করে (ইবাদত); এরপর এর থেকেও উন্নতর স্তর রয়েছে যেখানে কোনো কিছু চাওয়ার জন্য ইবাদত করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে সে স্মরণ করে, সেটির কারণে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে।] ঠিক যেমন মায়ের প্রতি সন্তানের এক ব্যক্তিগত ভালোবাসা থেকে থাকে। সুতরাং এই স্তরে পৌঁছে সে ইবাদত করার সময় কেবল খোদা তা'লাকে দেখেই না, বরং দেখে নিবেদিত প্রেমিকদের মতো (ভালোবাসার) পুলকও বোধ করে এবং প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা তিরোহিত হয়ে তার মাঝে ব্যক্তিগত এক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এটি সেই স্তর যা খোদা তা'লা ঈতায়ি যিল-কুরবা (আত্মীয়সুলভ বদান্যতা) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। আর এটির প্রতিই খোদা তা'লা فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا -এই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে তোমরা সেভাবে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহদের স্মরণ করে থাকো, বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করো। (সূরা বাকারা: ২০১)। সুতরাং এটি হলো সেই মর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ ভালোবাসা সৃষ্টি হবার স্তর।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা এটি হলো إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى (সূরা নহল: ৯১) আয়াতের তফসীর এবং এতে খোদা তা'লা মানবীয় তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি স্তরই বর্ণনা করেছেন এবং তৃতীয় স্তরকে ব্যক্তিগত ভালোবাসার স্তর আখ্যা দিয়েছেন। এটি হলো সেই স্তর যেখানে যাবতীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং হৃদয় সেভাবে ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায় যেমনটি এক শিশি আতরে পূর্ণ হয়ে থাকে; [অর্থাৎ আতরের শিশি যেমন হয়ে থাকে।] এই স্তরের প্রতিই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্যে কতিপয় এমনও হয়ে থাকে যারা নিজেদের প্রাণ খোদার সন্তুষ্টির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় এবং খোদা এমন ব্যক্তিদের প্রতি অতি সদয়। (সূরা বাকারা: ২০৮)। এবং আরো বলেছেন- بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ সেসব মানুষ মুক্তিপ্রাপ্ত যারা খোদার কাছে নিজেদের সত্তা সমর্পণ করে দেয় এবং তাঁর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করে এমনভাবে ইবাদত করে যেন তারা তাঁকে (চাক্ষুস) দেখতে পাচ্ছে; সুতরাং এমন ব্যক্তিরা খোদার কাছ থেকে প্রতিদান পেয়ে থাকে, এবং তাদের কোনো ভয়ও নেই আর তারা দুঃখিতও হয় না। (সূরা বাকারা: ১১৩)। অর্থাৎ খোদা ও খোদার ভালোবাসাই তাদের অভিষ্ট হয়ে যায় এবং খোদার নেয়ামতসমূহ তাদের প্রতিদান হয়ে থাকে। আবার আরেক স্থানে বলেছেন, يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا অর্থাৎ মু'মিন হলো তারা, যারা খোদার ভালোবাসায় মিসকীন (বা দুস্থ ,) এতীম ও বন্দিদের খাবার খাইয়ে থাকে এবং বলে, এই খাবার খাওয়ানোর জন্য আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না বা (এতে) আমাদের অন্য কোনো স্বার্থ নেই। এই সকল সেবার পেছনে কেবলমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভ

করা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। (সূরা দাহর: ৯-১০)। [এই যাবতীয় সেবার উদ্দেশ্য হলো আমাদের প্রতি খোদার সন্তুষ্টি, আল্লাহ্ তা'লাকে আরো ভালোভাবে দেখতে পাওয়া।] এখন চিন্তা করা উচিত, এই সবগুলো আয়াত থেকে কত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, পবিত্র কুরআন খোদার ইবাদত ও পুণ্যকর্মের সর্বোচ্চ ধাপ এটি নির্ধারণ করেছে যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা যেন স্বচ্ছ ও সত্য অন্তকরণে হয়।"

(নুরুল কুরআন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৪১)

এবং আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি ভালোবাসা লাভ করার জন্য তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতিও ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, যেমনটি এসব আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। তাদের প্রাপ্য একজন মু'মিন বান্দা, খোদা তা'লার প্রেমিক যথার্থভাবে আদায় করতে পারে এবং করে। অতঃপর কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা তোমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন? এটিই যে তোমরা সমগ্র মানবজাতির সাথে ন্যায়বিচার করো। এর চেয়েও উন্নত পুণ্য হলো, তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো যারা তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে নি। আরো উৎকৃষ্ট পুণ্য হলো, তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকূলের সাথে এমন সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করো যেন তোমরা তাদের সত্যিকার আত্মীয়, যেভাবে মা তার সন্তানদের সাথে করে। কেননা এহসান (তথা অনুগ্রহের) মাঝে এক প্রকার আত্মপ্রচারের উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে, আর অনুগ্রহকারী কখনও কখনও অনুগ্রহের খোঁটাও দিয়ে বসে। কিন্তু যে ব্যক্তি মায়ের ন্যায় সহজাত প্রেরণায় পুণ্য করে, সে কখনো আত্মপ্রচার করতে পারে না। অতএব নেকী তথা পুণ্যের সর্বশেষ স্তর হলো মায়ের মতো সহজাত প্রেরণা। আর এই আয়াতটি কেবল সৃষ্টিকূলের জন্যই নয় বরং খোদা তা'লার জন্যও। খোদা তা'লার সাথে আদল তথা ন্যায়বিচার হলো, তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণপূর্বক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা আর খোদা তা'লার সাথে এহসান হলো, তাঁর অস্তিত্বে এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন সে তাঁকে সাক্ষাৎ দেখছে আর খোদা তা'লার সাথে ঈতাই যিল-কুরবা হলো, কোনো বেহেশতের আশা কিংবা দোযখের ভয়ে তাঁর ইবাদত না করা; বরং যদি মনে করা হয় যে, বেহেশত-দোযখ বলে কোনো কিছু নেই তদুপরি ঐশীপ্রেমের উচ্ছ্বাসএবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য যেন দেখা না দেয়।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩০-৩১)

খোদা তা'লার সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা সংক্রান্ত যে বিস্তারিত বিবরণ কিশতিয়ে নূহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ের মোদ্দা কথা হলো এটি।

অতঃপর তিনি (আ.) হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আদেশ প্রদান করেন, তোমরা আদল তথা ন্যায়বিচার করো; এর চেয়ে উন্নত স্তর হলো ন্যায়বিচারের বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখে এহসানও (অনুগ্রহ) করো। আর অনুগ্রহের চেয়ে উন্নতি করে তোমরা মানুষের সাথে এমনভাবে সদ্ব্যবহার করো যেন তারা তোমাদের অতিপ্রিয়জন এবং নিকটাত্মীয়।

এখন ভেবে দেখা উচিত, (সদ্ব্যবহারের) স্তর ৩টি। প্রথমতঃ মানুষ আদল তথা সুবিচার করে অর্থাৎ অধিকারের বিপরীতে অধিকার দাবি করে। এর চেয়ে উন্নতি সাধন করলে এহসানের স্তরে উপনীত হয়। যদি এর চেয়ে উন্নতি সাধন করে তাহলে এহসানের মার্গকেও উপেক্ষা করে আর এমন প্রেমে মানুষের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করে যেভাবে মা তার সন্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, অর্থাৎ এক প্রকার স্বভাবজাত স্পৃহায় এমনটি করে; কোনো এহসান বা অনুগ্রহের মনমানসিকতা নিয়ে নয়।" (জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৭)

এটি হুকূ কুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের সারসংক্ষেপ।

তিনি (আ.) প্রথমে সাধারণ মানুষ ও বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। অতঃপর জামা'তকেও তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,খোদার সৃষ্টিকূলের সাথে এমনভাবে সদ্ব্যবহার করো যেন তোমরা তাদের সত্যিকারের আত্মীয়। এ স্তরটি সবার ওপরে, কেনন এহসানে (অনুগ্রহ) আত্মপ্রচারের একটি উপাদান নিহিত থাকে। কেউ যদি অনুগ্রহ অস্বীকার করে তবে অনুগ্রহকারী অমনি তাকে বলে বসে যে, আমি তোমার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছিলাম! অথচ সহজাত ভালোবাসা যা এক মায়ের তার সন্তানের সাথে হয়ে থাকে তাতে কোনো প্রকার লোকদেখানো ভাব থাকে না। যদি কেউ কারো প্রতি অনুগ্রহ করেও তবে কোনো এক সময় খোঁটাও দিয়ে ফেলে। কিন্তু মা তার সন্তানকে কখনো খোঁটা দেয় না। এমনকি যদি একজন রাজা কোনো মাকে এ আদেশ দেয় যে, তুমি তোমার সন্তানকে মেরে ফেললেও তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। সে কখনো এ-কথা শোনা পছন্দ করবে না এবং সেই বাদশাহকে গালি দিবে। অথচ সে জানে যে, (সন্তান) যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত আমি মারা যাবো, কিন্তু তবুও ব্যক্তিগত ভালোবাসার কারণে সে সন্তানের প্রতিপালন করা থেকে বিরত হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতা বার্ধক্যে থাকে আর তাদের সন্তানসন্ততিও থাকে, কিন্তু বাহ্যত সন্তানদের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার তাদের কোনো আশা থাকে না।কিন্তু তবুও তারা তাদের ভালোবাসে এবং লালনপালন করে। এটি একটি স্বভাবজাত বিষয়। যে ভালোবাসা এই স্তরে উপনীত হয় তার প্রতি ঈতায়ি যিল-কুরবাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে এ ধরনের ভালোবাসা হওয়া উচিত যেখানে না থাকবে মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা আর না অপমানের ভয়।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আদল বা ন্যায়বিচারের সর্বনিম্ন স্তর হলো যতটা নেবে ততটা দেবে। ন্যায়পরায়ণতা হলো যতটুকু নেবে ততটুকুই দেবে। অর্থাৎ এটিই হলো ন্যায়বিচারের ন্যূনতম মান। এর চেয়ে উন্নতি করলে রয়েছে এহসান বা অনুগ্রহের স্তর। যতটা নেবে ততটা তো দেবেই বরং এর চেয়ে বাড়িয়ে দেবে; এটি এহসান বা অনুগ্রহ। অর্থাৎ যতটুকু নিয়েছো ততটুকুই ফিরিয়ে দাও এবং তার চেয়েও বাড়িয়ে দাও। এর ঊর্ধ্বে রয়েছে ঈতায়ি যিল-কুরবার স্তর। অর্থাৎ অন্যদের সাথে সেভাবে সদাচার করা যেভাবে একজন মা তার সন্তানকে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, খোদাপ্রেমী মানুষ উন্নতি করে এ ধরনের ভালোবাসা লাভ করতে পারে। চাইলে উন্নতির ক্রমধারায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাস সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য খাটো নয়। আল্লাহ্‌র কৃপায় এসব বিষয় অর্জ ন হয়ে যায়, বরং এগুলো হলো উন্নত নৈতিকতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তিনি (আ.) বলেন, আমি তো বিশ্বাস করি, খোদাভক্তরা এতদূর উন্নতি করেন যে, মায়ের ভালোবাসার চাইতেও তারা মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫)

বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসা হয়ে যায়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আদল বা ন্যায়বিচারের অবস্থার সেরূপ যা মুত্তাকীর নফসে আম্মারা (তথা অবাধ্য আত্মায়) হয়ে থাকে। এ অবস্থার সংশোধনের জন্য ন্যায়বিচারের নির্দেশ রয়েছে। পাপপঙ্কিলতা থেকে বাইরে বের হওয়া, মন্দ চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া– এটিও ন্যায়বিচারের অবস্থা। এ ক্ষেত্রে নফসকে (নিজের) বিরোধিতা করতে হয়। পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নফস বা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করাও আদল বা ন্যায়বিচারের একটি ধরন। যেমন, কারো ঋণ পরিশোধ করার বিষয়টিকে নিন, নফস বা প্রবৃত্তি কোনোভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায় আর দৈবক্রমে যদি মেয়াদটাও পার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অবাধ্য প্রবৃত্তি আরো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে এবং ধৃষ্ট হয়ে যায় যে, এখন তো আইনগতভাবেও ধরা পড়া সম্ভব না। কিন্তু এটি ঠিক নয়। ন্যায়বিচারের দাবি হলো প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। অর্থাৎ অবশ্য পরিশোধযোগ্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং কোনো কৌলশ বা অজুহাতে এটি আত্মসাৎ করাযাবে না। কিছু লোক ঋণ আত্মসাৎ করতে বা সময়মতো পরিশোধ না করতে (চেষ্টা করে), কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলে কখনো কখানো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, পুরোপুরি অস্বীকার করে বসে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

প্রসঙ্গত আমি এটিও বলে দিতে চাই যে, অনেক সময় লেনদেনে ঝগড়াবিবাদ শুরু হওয়ার কারণ হলো মানুষ অন্যের প্রতি অযৌক্তিক আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, যখনই লেনদেনের বিষয় আসবে তখনই তা লিখে নিবে।

এমন নয় যে, আমার নিকট আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই আমি লিখব না। এ কারণেই বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলেই নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মা মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে।যাহোক, একজন মু'মিনের দায়িত্ব হলো এসব বিষয় এড়িয়ে চলা এবং ন্যায়বিচার করা।

তিনি (আ.) বলেন, আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কিছু লোক এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয় না এবং আমাদের জামা'তেও এমন লোক আছে যারা তাদের ঋণ পশিোধের প্রতি খুব কম মনোযোগী। এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কাজ।

মহানবী (সা.) এমন লোকদের (জানাযার) নামায পড়তেন না। তাই তোমাদের প্রত্যেকেরই ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অলসতা করা উচিত নয়। সকল প্রকারের খেয়ানত ও বেঈমানী থেকে দূ রে থাকা উচিত, কেননা এটি ঐশী নির্দেশ পরিপন্থী যা তিনি এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আবার তিনি (আ.) বলেন, "এরপর রয়েছে এহসান বা অনু গ্রহের স্তর। যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার করার বিষয়ে যত্নবান এবং এর সীমা অতিক্রম করে না, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শক্তিসামর্থ্য দান করেন আর সে পুণ্যকর্মে আরো উন্নতি করে। এমনকি সে কেবল ন্যায়বিচারই নয় বরং সে সামান্য পুণ্যের বিনিময়ে অনেক

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফূযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

বড়ো পুণ্যকর্ম করে। কিন্তু এহসান বা অনুগ্রহ করার পর্যায়ে একটি দুর্বলতা অবশিষ্ট রয়ে যায় আর তা হলো, কোনো না কোনো সময় সে সেই পুণ্যকর্মের খোঁটা দিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি দশ বছর যাবৎ কোনো ব্যক্তিকে আহার করায় আর সে যদি কোনো সময় তার কোনো একটি কথা না শোনে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বলে বসে, দশ বছর ধরে তুমি আমার অনুগ্রহে চলেছো। আর এভাবে সে সেই পুণ্যকর্মকে বিনষ্ট করে বসে। মূলতঃ অনুগ্রহকারীর মাঝেও এক ধরনের সুপ্ত লোক দেখানো ভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায় যা সকল প্রকার দুর্বলতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র আর তা হলো ঈতায়ি যিলকুরবা-এর স্তর।

তিনি (আ.) বলেন, ঈতায়ি যিল-কুরবা-এর স্তর হলো একটি প্রকৃতিগত অবস্থার স্তর, অর্থাৎ যে পর্যায়ে মানুষের দ্বারা পুণ্যকর্মগুলো সেভাবে সংঘটিত হয় যেভাবে প্রকৃতিগত বা সহজাত দাবির ফলে হয়ে থাকে। মায়ের বাচ্চাকে দুধ পান করানো ও লালনপালনের বিষয়টিকে এর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। কখনো তার মনে এ চিন্তারও উদ্রেক হয় না যে, বড়ো হয়ে সে উপার্জন করবে এবং তার সেবাশুশ্রূষা করবে। এমনকি কোনো বাদশাহ যদি তাকে এ নির্দেশ দেয় যে, তুমি যদি তোমার বাচ্চাকে দুধ না দাও আর এর ফলে সে মারা যায় তাহলে তোমাকে কোনোভাবে পাকড়াও করা হবে না। এ নির্দেশের পরও সে তাকে দুধ পান করানো বাদ দিতে পারে না, বরং এমন বা দশাহকে সে দু -চারটি গালমন্দও শুনিয়ে দিবে, কেননা সেই লালনপালন তার একটি প্রকৃতিগত দাবি। এটি কোনো প্রত্যাশা কিংবা ভয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। একইভাবে মানুষ যখন উন্নতি করতে করতে এমন স্তরে উপনীত হয় যেখানে সেই পুণ্যকর্ম তার দ্বারা এমনভাবে সংঘটিত হয় যেন এটি একটি প্রকৃতিগত দাবি। অতএব এটিই সেই অবস্থা যাকে মুতমাইন্না বা পরিতৃপ্ত আত্মা বলা হয়।”

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩১২-৩১৪)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মা নিজে কষ্ট সহ্য করে হলেও সন্তানকে আরামে রাখার চেষ্টা করে। নিজে ভেজা জায়গায় শোয় অথচ তাকে বিছানার শুকনো স্থানে জায়গা করে দেয়। বাচ্চা অসুস্থ হলে বিনিদ্র রাত কাটায় এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করে। এখন বলো! মা নিজের সন্তানের জন্য যা কিছু করে তার মাঝে কি কোনো কৃত্রিমতা এবং লৌকিকতার কিছু পাওয়া যায়?” এটি তো খাঁটি ভালোবাসার ফলেই হয়ে থাকে আর এই ভালোবাসাই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একজন মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অনুগ্রহের স্তর পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হও এবং ঈতায়িযিল-কুরবা পর্যন্ত উন্নতি করো আর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি কোনো প্রতিদান, কিংবা সেবা লাভের চিন্তা না করে প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ স্পৃহা থেকে পুণ্যকর্ম করো। আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের সাথে তোমরা এমনভাবে পুণ্য করো যেন তাতে কোনো কৃত্রিমতা এবং লোকদেখানো ভাব না থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا (সূরা দহর:১০) অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্ত এবং আধ্যাত্মিকতার পরম মার্গে উপনীত মানুষের রীতি হলো, তার পুণ্যকর্ম কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরেই হয়ে থাকে আর তার হৃদয়ে এ ধারণাও থাকে না যে, এই পুণ্যকর্মের ফলে তার জন্য দোয়া করা হবে কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে। পুণ্যকর্ম কেবল সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করে থাকে যা মানবজাতির জন্য তার হৃদয়ে প্রোথিত রাখা হয়েছে।

এমন পবিত্র শিক্ষা আমরা তওরাতেও দেখি নি এবং ইঞ্জিলেও না। আমরা এর একেকটি পৃষ্ঠা পড়েছি কিন্তু এমন পবিত্র ও পরিপূর্ণ শিক্ষার নামগন্ধও সেখানে নেই।” (মালফুযাত, ১০ খণ্ড, পৃ: ৪১৬-৪১৭)

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হলো, পুণ্যের বিপরীতে পুণ্য করো। কিন্তু যদি ন্যায়বিচারের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে কোনো অনুগ্রহ বা এহসান করার সুযোগ হয় তবে সেখানে অনুগ্রহ করো। আর যদি অনুগ্রহের চেয়ে এগিয়ে স্বজনদের ন্যায় স্বভাবজ আবেগে পুণ্য করার সুযোগ পাও তবে সেখানে স্বভাবজ ভালোবাসার টানে পুণ্য করো। আর খোদা তা'লা এথেকে বারণ করেন যে, তোমরা ভারসাম্য হারিয়ে বসবে। ভারসাম্য সর্বাবস্থায় বজায় রাখতে হবে। (খোদা তা'লা এথেকে বারণ করেন যে,) অনুগ্রহের ক্ষেত্রে অপছন্দনীয় অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে যা বিবেকবুদ্ধির পরিপন্থি , অর্থাৎ তোমরা অপাত্রে অনুগ্রহ করবে কিংবা যথাস্থানে অনুগ্রহ করতে দ্বিধা করবে। বিবেক ও ন্যায়বিচারের দাবিও সামনে রাখতে হবে যেন অনুগ্রহ অপাত্রে না করা হয়, আবার যে স্থানে অনুগ্রহ করা আবশ্যক সেখানেও যেন অনুগ্রহ করতে অস্বীকৃতি না জানানো হয়। মোটকথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, বিবেকবুদ্ধি কী বলে এবং কল্যাণ কিসে নিহিত? (খোদা তা'লা এথেকেও বারণ করেন যে,) তোমরা যথাস্থানে ঈতায়িযিল-কুরবা তথা আত্মীয়সুলভ আচরণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা শৈথিল্য প্রদর্শন করবে অথবা সীমাতিরিক্ত দয়ামায়া প্রদর্শন করবে। এ আয়াতে পুণ্য অর্জনের তিনটি স্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে।”

অতএব যেখানে এ পুণ্য করার নির্দেশ রয়েছে সেখানে বিবেক খাটানোর, ন্যায়বিচার করার ও সৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নির্দেশ হলো, সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য নয় বরং তোমাদের সব পুণ্য যেন কল্যাণ সাধনের কারণ হয়।

মা তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসা সত্ত্বেও কখনোই তার দাবির মুখে তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে দেয় না। অতএব মূল উদ্দেশ্য হলো মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন আর এর জন্য এ তিনটি পুণ্য সম্পাদন করতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রথম পর্যায় হলো পুণ্যের বদলে পুণ্য করা। যারা পুণ্য করে তাদের সাথে পুণ্য করা। এটি তো নিম্ন পর্যায় আর নিম্ন স্তরের কোনো ভদ্র লোকও করতে পারে। অর্থাৎ যে-কোনোভদ্র মানুষের সদাচার করা– এটি একটি মৌলিক বিষয়। এটি কোনো উচ্চাঙ্গের পুণ্য নয় বরং সাধারণ ভদ্রতা। দ্বিতীয় পর্যায়টি এরচেয়ে কঠিন আর সেটি হলো সূচনাস্বরূপ নিজের পক্ষ থেকে পুণ্য করা এবং কারো অধিকার ছাড়াই অনুগ্রহস্বরূপ তার কল্যাণ সাধন করা। আর এটি হলো মধ্যম পর্যায়ের চারিত্রিক গুণ। পুণ্য করা এবং কারো অধিকার ছাড়াই তার প্রতি অনুগ্রহ করা, তার উপকার করা আর এটিও মধ্যম পর্যায়ের নৈতিক গুণ। বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহ করে, কিন্তু অনুগ্রহের ভেতর একটি সুপ্ত ব্যাধি থাকে। তা হলো অনুগ্রহকারী মনে করে, 'আমি অনুগ্রহ করেছি' আর সে কমপক্ষে নিজের অনুগ্রহের বিপরীতে কৃতজ্ঞতা বা দোয়া প্রত্যাশা করে। কিন্তু অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি তার বিরোধী হয়ে যায় তাহলে তাকে অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেয়। কেউ কেউ তো নিজ অনুগ্রহের কারণে তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়। যেহেতু আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং এতটা সময় তোমার কাজে লেগেছি বা আমার কাছ থেকে তুমি উপকৃত হয়েছো, একারণে অনুগ্রহকারী তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় আর তাকে তার অনুগ্রহের খোঁটা দেয়। যেমন অনুগ্রহকারীকে খে াদা তা'লা সতর্ক করতে বলেন, لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى (আল বাকারা: ২৬৫) অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারীরা! তোমার নিজেদের সদকাকে যার ভিত্তি আন্তরিকতার ওপর হওয়ার কথা, অনুগ্রহের খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সতর্ক করে বলেছেন, এরূপ অনুগ্রহ করা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। তোমরা যে সদকা করছো তার ভিত্তি সততা ও নিষ্ঠার ওপর হওয়ার কথা। কাজেই যদি অনুগ্রহের খোঁটা দাও তবে তোমাদের সব পুণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ সদকা শব্দটি সিদ্‌ক থেকে উদ্ভূত। অতএব হৃদয়ে সততা ও নিষ্ঠা না থাকলে সেই সদকা সদকা থাকে না, বরং এটি লোকদেখানো কর্ম হয়ে যায়। মোটকথা অনুগ্রহকারীর মধ্যে এই ত্রুটি থাকে যে, কখনো রাগান্বিত হয়ে নিজের অনুগ্রহের খোঁটা দিয়ে দেয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীদের সতর্ক করেছেন।

খোদা তা'লা কল্যাণ সাধনের তৃতীয় যে স্তরের কথা বলেছেন তা হলো, অনুগ্রহ যে করেছো সেকথা যেন মাথায় না আসে আর কৃতজ্ঞতার প্রতিও যেন দৃষ্টি না থাকে, বরং এমন এক সহানুভূতির প্রেরণায় পুণ্য সম্পাদিত হওয়া উচিত যেমনটি কোনো একান্ত নিকটাত্মীয় করে থাকে। যেমন এক মা কেবল মমতার প্রেরণায় আপন সন্তানের উপকার সাধন করে থাকে। এটি কল্যাণ সাধনের চূড়ান্ত স্তর; এরচেয়ে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু খোদা তা'লা কল্যাণ সাধনের এসব ধরনকে স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন আর উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, এসব কল্যাণ সাধন বা পুণ্য যদি নিজ নিজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ না হয় তাহলে এগুলো মন্দকর্ম হয়ে যাবে। এটিও একটি সাবধানবাণী, পুণ্যকর্ম যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে না হয়, যথাযথভাবে না হয়, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে– তাহলে পুণ্য নয় বরং পাপে পর্যবসিত হবে। ন্যায়বিচার হওয়ার পরিবর্তে অশ্লীলতায় পরিণত হবে। মন্দ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করার পরবর্তী যে ধাপ রয়েছে তারও কিছুটা উল্লেখ এখানে এসে যায়, অর্থাৎ আদল বা ন্যায়বিচার অশ্লীল বা অপকর্মে পরিণত হবে। অর্থাৎ এতটাও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া যার ফলে তা অপবিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। আর একইভাবে এহসান বাঅনুগ্রহের পরিবর্তে তা অপছন্দনীয় বিষয়ের রূপ নেবে। তখন এটি আর অনুগ্রহ হবে না বরং এটি মুনকার বা মন্দকর্ম হয়ে যাবে। অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যাকে বিবেক ও জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করে এবং সেটি তখন ঈতায়ি যিল-কু রবা তথা নিকটাত্মীয়সুলভ কল্যাণ গণ্য না হয়ে বাগী তথা বিদ্রোহ হয়ে যায়। অর্থাৎ অস্থানে সহানুভূতির আবেগ একটি কুৎসিত চিত্র সামনে নিয়ে আসবে। আসলে বাগী সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যা মাত্রারিক্ত বর্ষিত হয় এবং ফসলাদি ধ্বংস করে দেয়। আবশ্যকীয় অধিকার প্রদানে যদি ঘাটতি থেকে যায় সেটিকে বাগী বলে, আবার অতিরিক্ত প্রদান করাকেও বাগী বলে। বস্তুতঃ এই তিনটির মধ্য থেকে যেটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না সেটিই কুৎসিত রূপ ধারণ করবে। তাই এই তিনটির সাথেই স্থান-কাল-পাত্রকে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ স্থলে মনে রাখতে হবে, নিছক আদল বা এহসান বা নিকট

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“ তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।”

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতিকে নৈতিক চরিত্র বলা যায় না, বরং মানুষের মাঝে এগুলো সবই স্বভাবজ অবস্থা এবং স্বভাবজ শক্তিবৃত্তি, এগুলো বাচ্চাদের মাঝে বোধ সৃষ্টিরও পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু চারিত্রিক গুণের জন্য বিবেক ও বোধ পূর্ব শর্ত। অধিকন্তু এ শর্তও রয়েছে যে, প্রতিটি স্বভাবজ গুণ বা বৈশিষ্ট্য স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে।

এরপর এহসান বা অনুগ্রহের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষামালা রয়েছে আর সবগুলো আলিফ-লাম দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে যা কোন জিনিসকে বিশেষ বা নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এমনটি করে স্থান-কাল-পাত্রের উপযুক্ততার শর্তের প্রতি নির্দেশ করেছে।

(ইসলামী নীতি-দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৩-৩৫৫)

অর্থাৎ এসব সদগুণ বা নৈতিক গুণাবলীকে বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে অর্থাৎ বলে দেওয়া হয়েছে, এই এই নৈতিক গুণ অমুক অমুক জিনিসের জন্য নির্ধারিত। অতএব, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এসব পুণ্য সম্পাদন করার জন্য তিনি আমাদেরকে নসীহত করেছেন। পুণ্য করা প্রসঙ্গে অর্থাৎ অনুগ্রহ করা প্রসঙ্গে তিনি নিজের একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এহসান বা অনুগ্রহ একটি অতি উন্নত গুণ। এর মাধ্যমে মানুষ বড় বড় বিরুদ্ধবাদীকেও বশীভূত করে। যেমন, শিয়ালকোটে এক ব্যক্তি ছিল যে সবার সাথে ঝগড়া রাখতো আর এমন কেউ ছিল না যার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। এমনকি তার ভাই, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনরাও তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সাথে আমি কোনো কোনো সময় সামান্য ভাল ব্যবহার করেছি আর এর বিনিময়ে কখনো সে আমার সাথে মন্দ আচরণ করে নি, বরং যখনই আমার সাথে সাক্ষাৎ হতো খুবই শ্রদ্ধার সাথে কথাবলতো। তেমনিভাবে এক আরব ব্যক্তি আমাদের কাছে আসে আর সে ওয়াহাবীদের ঘোর বিরোধী ছিল,এমনকি তার সামনে ওয়াহাবীদের নাম নিলেও গালিগালাজ শুরু করে দিত। এই ব্যক্তি এখানে এসেও নোংরা গালিগালাজ দেয়া আরম্ভ করে এবং ওয়াহাবীদের গালমন্দ করতে থাকে। আমি এসবের কোনো পরোয়া না করে তার সর্বাত্মক সেবা করেছি এবং যথাযথাভাবে তাকে দাওয়াত খাইয়েছি। একদিন সে যখন রাগের আতিশয্যে ওয়াহাবীদেরকে চরম গালিগালাজ করছিল তখন কেউ একজন তাকে বলে, 'যার ঘরে তুমি আতিথ্য গ্রহণ করেছ তিনিও তো ওয়াহাবী।' সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। একথা শুনে সে চুপ হয়ে যায়।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি বলেছিল, 'তিনি ওয়াহাবী'- সেই ব্যক্তির আমাকে ওয়াহাবী বলা ভুল ছিল না। কেননা আমি পবিত্র কুরআনের পরে সহীহ হাদীসসমূহের ওপর আমল করা জরুরি বলে মনে করি। যাহোক, কিছুদিন পর সে ব্যক্তি চলে যায়। এরপর একবার লাহোরে আমার সাথে আবার দেখা হয়। যদিও বা সে ওয়াহাবীদের চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না, কিন্তু যেহেতু তাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছিল এজন্য তার সমস্ত উত্তেজনা ও ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে যায়। আর সে আমার সাথে পরম সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করে। অনেকবার অনুরোধ করে আমাকে তার সাথে একটি ছোট মসজিদে নিয়ে যায় যে মসজিদের সে ইমাম ছিল। সেখানে নিয়ে আমাকে বসায় এবং এক ভৃত্যের ন্যায় বাতাস করতে থাকে। অনেক জোর দিয়ে বলে যে, চা ইত্যাদি কিছু পান করে যাবেন। অতএব, দেখো, অনুগ্রহ কীভাবে মানুষের হৃদয়কে জয় করে।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০২)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটি হলো যা বর্তমান যুগের নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা উপস্থাপন করে; সাক্ষাতে বাহ্যত তোষামোদী ও চাটুকারিতা প্রদর্শন করে। তোষামোদ অর্থ জি হুযূর, জি হুযূর করে কিন্তু হৃদয় কপটতা এবং বিদ্বেষে পরিপূর্ণ থাকে। এমন চরিত্র পবিত্র কুরআন বিরোধী। দ্বিতীয় প্রকারের চরিত্র হলো সত্যিকার সহানুভূতি লালন করবে, হৃদয়ে যেন কপটতা না থাকে এবং তোষামোদী ও চাটুকারিতার আশ্রয় যেন না নেয়। যেমন, খোদাতা'লা বলেন, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى । (সূরা নহল: ৯১) এটি হলো উৎকর্ষ পদ্ধতি বা রীতি। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট রীতি ও হেদায়াত খোদার কালামে বিদ্যমান রয়েছে। যে এটি থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে বা বিমুখ হবে সে অন্যত্র হেদায়াত পেতে পারে না। উত্তম শিক্ষা আপন প্রভাব বিস্তারের জন্য হৃদয়ের পবিত্রতা চায়। যারা এ থেকে রিক্তহস্ত তাদেরকে যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখো তাহলে তাদের মাঝে অবশ্যই নোংরামি দেখতে পাবে। জীবনের কোন ভরসা নেই। নামায, সততা ও পবিত্রতায় উন্নতি করো।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০০)

তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, নামায, সততা ও নিষ্ঠা এবং পবিত্রতায় উন্নতি করো; ইবাদত, সততা এবং পবিত্রতায় উন্নতি করো।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে বারবার এ উপদেশই দিই যে, তোমরা কখনোই নিজ সহানুভূতির গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করো না। সহানুভূতির জন্য সেই শিক্ষার অনুসরণ করো যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। অর্থাৎ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى (সূরা নহল: ৯১) অর্থাৎ, পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রথমত তোমরা আদল বা ন্যায়বিচারকে দৃষ্টিপটে রাখ। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে পুণ্য করে তোমরাও তার সাথে ভালো ব্যবহার করো, পুণ্য করো। এরপর দ্বিতীয় স্তর হলো তোমরা এর চেয়েও উন্নত মার্গের আচরণ করো; এটি হলো এহসান। এহসানের স্তর বা পর্যায় আদল বা ন্যায়বিচারের চেয়ে উন্নত স্তর আর এটি অনেক বড় পুণ্য। কিন্তু অনুগ্রহকারী কখনো কখনো খোঁটা দিয়ে বসতে পারে। কিন্তু এসবের চেয়েও উন্নত একটি স্তর রয়েছে অর্থাৎ মানুষ এমনভাবে পুণ্য করবে যা ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রেরণায় হয়ে থাকে। যাতে অনুগ্রহ দেখানোর কোন বিষয় অন্তর্হিত থাকে না। যেমন মা নিজ সন্তানের লালনপালন করে থাকে। সে এই লালনপালনে কোন পুরস্কার ও সেবার প্রত্যাশী হয় না। বরং এক প্রকৃতিগত আবেগ থাকে যার কারণে শিশুর জন্য নিজের সমস্ত সুখ এবং আরামকে বিসর্জন দেয়। যদি বাদশাহও তাকে বলে, তুমি এ বাচ্চাকে দুধ পান করাবে না, তাহলে সে বাদশাহকে গালমন্দ করবে। সুতরাং এমনভাবে পু ণ্য করতে হবে যেন তা স্বভাবজ গুণের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। কেননা কোনো জিনিস যখন উন্নতি করতে করতে সহজাত উৎকর্ষতায় পৌঁছে যায় তখন সেটি পূর্ণতা পায়।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮২)

তিনি (আ.) বলেন, "খোদা আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা গোটা পৃথিবীর সাথে ন্যায়বিচার করো। অর্থাৎ, যতটুকু অধিকার প্রাপ্য ততটুকুই নাও এবং মানবজাতির সাথে ন্যায়পূর্ণ আচরণ করো। এর চেয়ে বড় নির্দেশনা হলো, তোমরা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহের আচরণ করো। অর্থাৎ সে আচরণ প্রদর্শন করো যে আচরণ করা তোমার জন্য আবশ্যক নয়, যা কেবল মানবতা প্রদর্শনমূলক। কিন্তু যেহেতু অনুগ্রহের মাঝেও একটি সুপ্ত ব্যাধি রয়েছে যে, অনুগ্রহকারীও কখনো কখনো ক্রোধান্বিত হয়ে অনুগ্রহের খোঁটা দিয়ে বসে, এজন্য এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- পরিপূর্ণ নেকী হলো, তোমরা মানবজাতির প্রতিসেভাবে পুণ্য কাজ করো যেভাবে মা তার সন্তানের প্রতি পুণ্য করে থাকে। কেননা সে পুণ্যকাজ শুধুমাত্র স্বভাবজ প্রেরণায় হয়ে থাকে আর কোন প্রতিদানের লোভে নয়। তার হৃদয়ে এ ধারণাই থাকে না যে, এ সন্তান এই সেবার বিনিময়ে আমাকেও কোনো কিছু প্রদান করবে। সুতরাং সেই কল্যাণ সাধন যা মানবজাতির প্রতি করা হয় তার এই স্তর হচ্ছে তৃতীয় স্তর যাকে ঈতায়ি যিল-কুরবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৮৮)

সুতরাং পুণ্যকাজ শুধুমাত্র আপনজনদের সাথে নয় বরং সবার সাথেই করা উচিত। আর কোনোপ্রতিদানের আশাবাদী না হয়ে পুণ্য করার নির্দেশ রয়েছে। আর এটিই সে পদমর্যাদা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়া যায় যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ পুস্তকাবলী ও বৈঠকে এ বিষয়ে অসংখ্যবার তাগাদা দিয়েছেন। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো ধর্মের শিক্ষায় নেই।

তাই আমাদের কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের প্রকৃত মান অর্জনের জন্য আর বান্দার অধিকার আদায়ের জন্যও ইসলামী শিক্ষানুসারে কাজ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ইসলামী শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। ইবাদতের উন্নত মানে আমাদেরকে উপনীত হওয়ার তৌফিক দিন। আমরা যেন বান্দার অধিকার আদায়কারী হতে পারি। বিশেষত পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক যেন এমন হয় যা পৃথিবীবাসীর জন্য এক দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সকল কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বয়াতের কারণে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য প্রদান করুন। তাঁর বয়াতের শর্তাবলীর মাঝেও মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার শর্ত রয়েছে। প্রতিটি জুমুআয় আল্লাহ্ তা'লার এ সকল শব্দাবলীকে শোনা, পুণ্যকাজে অগ্রগামী হওয়া ও আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার যেন কারণ হয়। নতুবা আমাদের ও অন্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও অন্যদের মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করুন যেভাবে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত ব্যকুলতার সাথে তা উল্লেখ করেছেন। (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৫২)

পাকিস্তানের অবস্থার জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন।

আমাদেরকে তো পুণ্য ছড়ানোর জন্য নিজ কাজ চলমান রাখতে হবে। আর শয়তান স্বভাববিশিষ্টরা অন্যায় করে যাবে যা হলো তাদের কাজ। এসব শয়তানির ক্ষেত্রে এদের সাথে আমাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি তা নেই। আমাদের কাজ কাজ হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী চলতে পারি।

সর্বদা এ দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের ঈমানের সুরক্ষা করেন আর কখনো আমাদের ঈমান যেন দোদুল্যমান না হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হোক যা ঈতায়ি যিল-কুরবার স্তরে লাভ হয়। তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির দৃশ্যাবলীও পূর্বের চেয়ে অধিক হারে দেখতে পাবো, ইনশাআল্লাহ্। আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যারা শত্রু ও সংশোধনের অযোগ্য তাদের তিনি স্বয়ং ধ্বংস করুন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের যখন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে তখন শত্রুদের ধ্বংস হবার দৃশ্যও আমরা প্রত্যক্ষ করবো। **********

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: ভারতের কেরালা থেকে একজন মুরুব্বী সাহেব হুযুর আনোয়ারের নিকট চিঠি লিখে জানান, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন 'হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) এর মৃত্যুর পর পোলোস ত্রিত্ববাদের সূচনা করে। অপরদিকে আহমদীদের মত অনুযায়ী হযরত মসীহ (আ.) একশ কুড়ি বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন আর পোলোস এর পূর্বেই মারা যায়। এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা যাচনা করি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২২ সালের ৩১শে জানুয়ারী এই প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

আপনি আপনার চিঠিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন সেটি তাঁর রচনা চাশমায়ে মসীহ্‌র অংশ। এই পুস্তকটি হুযুর (আ.) বারেলীর জনৈক মুসলমানের চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি জনৈক খৃষ্টান রচিত 'ইয়ানুল ইসলাম' পুস্তকে ইসলামের উপর উত্থিত কতিপয় আপত্তির উত্তর দিয়েছিলেন। হুযুর (আই.) তাঁর এই রচনায় খৃষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস এবং ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান গবেষকদের পক্ষ থেকে খৃষ্টধর্মের উপর হওয়া গবেষণার ভিত্তিতে এই চিঠিতে ইসলামের উপর করা আপত্তির প্রত্যুত্তর করেছেন এবং খৃষ্টধর্মের বিকৃত শিক্ষামালার বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই হুযুর (আ.) খৃষ্টধর্মের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, 'পোলোস হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রাণের শত্রু ছিল এবং যেমনটি ইহুদীদের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর তার খৃষ্টান হওয়ার হওয়ার কারণ ছিল তার নিজস্ব কিছু স্বার্থ সিদ্ধি যেগুলি ইহুদীদের দ্বারা পূর্ণ হয় নি। তাই ইহুদীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। এবং লোকের কাছে একথা প্রকাশ করে যে, হযরত মসীহ্ তার সঙ্গে দিব্যদর্শনে সাক্ষাত করেছেন এবং সে তাঁর উপর ঈমান এনেছে। সে সর্বপ্রথম ত্রিত্ববাদের বিকৃত বৃক্ষ রোপন করে দামাস্ক এ আর পোলোসীয় ত্রিত্ববাদের সূচনা দামাস্ক থেকেই। "

(চাশমায়ে মসীহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৭৬-৩৭৭)

অতএব, হুযুর (আ.)-এর উক্তি 'যেমনটি ইহুদীদের ইতিহাসে বর্ণিত আছে' থেকে প্রমাণ হয় যে, এখানে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু বলতে খৃষ্টীয় মতবাদ অনুসারে তাঁর মুত্যুকে বোঝানো হয়েছে যখন কি না তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই সম্মানীয় নবীকে বাইবেলে বর্ণিত অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে ক্রুশের মৃত্যু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যার পর তিনি তাঁর অবশিষ্ট দশটি গোষ্ঠীর সন্ধানে কাশ্মীর অভিমুখে হিজরত করেন। যেখানে ইউয আসফ নবী নামে তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের তরবীয়ত করেন এবং একশ কুড়ি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই কাশ্মীরে মহল্লা খান ইয়ার সমাহিত আছেন। সেই সমাধি আজও বিদ্যমান। যতদূর পোলোস এর প্রসঙ্গ, তার বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে বলেন- 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন কুফরীর ফতওয়া লিখা হইয়াছেল, তখন সাধু পৌলও (# ইংরেজি) সেই কুফরীর ফতওয়াদাতাগণের দলভুক্ত ছিল। পরে সে নিজেকে মসীহ্‌র রসূল বলিয়া প্রচার করে। এই ব্যক্তি হযরত মসীহ্‌র জীবদ্দশায় তাঁহার ভীষণ শত্রু ছিল। হযরত মসীহ্‌র যত ইঞ্জিল রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটিতেও এই ভবিষ্যদ্বাণী নাই যে, তাহার পর সাধু পৌল তওবা করিয়া রসূল হইবে। এই ব্যক্তির অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখা আমার আদৌ প্রয়োজন নাই, কেননা খৃষ্টানগণ তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। আফসোস, এই সেই ব্যক্তি, যে হযরত মসীহ্ যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল, এবং যখন তিনি ক্রুশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কাশ্মীরের দিকে চলিয়া আসেন, তখন সে এক মিথ্যা স্বপ্নের সাহায্যে হাওয়ারীগণের মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করিয়া ত্রিত্ববাদের মত অবলম্বন করে এবং শুকর ভক্ষণ, যাহা তওরাতের শিক্ষানুযায়ী চিরকালের জন্য হারাম ছিল, খৃষ্টানদের জন্য তাহা হালাল করিয়া দেয়, সুরাপান ব্যাপকভাবে প্রচলন করে এবং বাইবেলের শিক্ষার মধ্যে ত্রিত্ববাদ প্রবিষ্ট করিয়া দেয় যাহাতে এই সকল বেদাত অনুষ্ঠানের প্রবর্তনে গ্রীক দেশীয় পৌত্তলিকগণ খুশী হয়।'

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৬৫)

অতএব,চাশমায়ে মসীহি পুস্তকের বর্ণনায় হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বলতে খৃষ্টীয় মতবাদ অনুসারে তাঁর মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে যখন কি না তাঁকে ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল, আমাদের মতবাদ অনুসারে তাঁর মৃত্যুকে বোঝানো হয় নি।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি হুযুরের নিকট জানতে চান যে, দৃষ্টির নাগালের বাইরে প্রত্যেকটি বস্তুই কি জ্বিন্ন? ইবলিস ও ফিরিশতারাও জিন্ন হতে পারে?

আহমদীরা কি আফরিয়াতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে? আমরা পড়েছি যে, আগমণকারী মাহদী শেষ যুগে আবির্ভুত হবেন। আমরা কি সত্যিই শেষ যুগে বাস করছি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লা, হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ কিম্বা হযরত হযরত মসীহ (আ.) এর নামে শপথ করতে পারি? হুযুর (আই.) ২০২২ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারী এই প্রশ্নগুলির উত্তরে লেখেন-

১লা অক্টোবর ২০২১ তারিখের চিঠিতে আমি এর উত্তরে জিন্নদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলাম। সেখানে আপনার প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে পড়ে নিন।

এছাড়া আফরিয়াত সম্পর্কে জামাত আহমদীয়া সেটাই বিশ্বাস করে যা কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে শিখিয়েছে। সূরা নহলে হযরত সুলেমান (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَ اِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ

(সূরা নমল: ৪০)

জিন্ন শব্দটি, যেমনটি আমি চিঠিতে ইতিপূর্বেই স্পষ্ট করেছি, একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই ব্যক্তিকেও জিন্ন বলা হয় যার মধ্যে আগুনের স্বভাব ও বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়- আগুনে মেজাজের মানুষ যারা দ্রুত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অতএব, যোদ্ধাবাজ, বিশৃঙ্খলাপরায়ণ, বিদ্রোহীভাবাপন্ন এবং অবাধ্য প্রকৃতির মানুষদেরও জিন্ন বলা হয়। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলেমান (আ.) যে সকল জাতির উপর বিজয়ী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কতিপয় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কষ্টসহনকারী জাতি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে আগুনে স্বভাব ও বিদ্রোহীমনোভাব ও অবাধ্যতার বৈশিষ্ট্যও ছিল। হযরত দাউদ এবং হযরত সুলেমান (আ.) তাঁদের খোদা প্রদত্ত বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা সেই জাতিগুলিকে নিজেদের আয়ত্বে এনেছিলেন এবং অনুগত জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত সুলেমান (আ.) -এর রাজত্বে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একাধিক জাতিকে তাঁর অনুসারী বানিয়েছিলেন যাদের জন্য কুরআন করীম বিভিন্ন শব্দবন্ধন ব্যবহার করেছেন। সূরা সাবার ১৩-১৫ নম্বরং আয়াতে এমন মানুষদের জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে সূরা সাদ এর ৩৮-৩৯ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৮৩ নম্বর আয়াতে তাদের জন্য শায়াতীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর এই শব্দগুলি দ্বারা অবাধ্য ও বিশৃঙ্খলাপরায়ন জাতিকে বোঝানো হয়েছে যাদেরকে হযরত সুলেমান (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে নিজ অধীনস্ত করেছিলেন এবং নিজ রাজ্যের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। আফরিয়াতও এই ধরণের এক জাতির সর্দার ছিল, যাকে হযরত সুলেমান (আ.) এর রাজত্বেও উচ্চ মর্যদা দেওয়া হয়েছিল।

হাদীসেও আফরিয়াত শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হুযুর (আ.) বলেছেন, গত রাতে জিন্নদের মধ্য থেকে আফিরিয়াত (অর্থাৎ কুৎসিত দর্শন এক পশু সদৃশ এক ব্যক্তি) আমার নামায ভঙ্গ করার জন্য আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তার উপর নিয়ন্ত্রণ দেন এবং আমি তাকে ধরে ফেলি। আর আমি স্থির করি যে, আমি তাকে মসজিদের থামে বেঁধে রাখব, যাতে তোমরা সকলে তাকে দেখতে পাও। এরপর আমার ভাই সুলেমান এর কথা স্মরণ আসে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর। এবং এমন এক সাম্রাজ্য দান কর যা আমার পর অন্য কেউ অর্জন করতে পারবে নাা।' এরপর আমি তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিই। ইমাম বুখারী বলেন, আফরিয়াত এর অর্থ অবাধ্য, সে মানুষ হোক বা জিন্ন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া)

এই ঘটনা বুখারীতে এবং অন্যান্য স্থানেও বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুস সালাত এর বর্ণনায় হুযুর (সা.) এর নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তির জন্য ইফরিয়াত শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কিতাবুল জুমআ বা মা ইয়াজুযু মিনাল আমালে ফিসসলাতে এ বর্ণিত হাদীসে হুযুর (সা.) এর জন্য শয়তান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এই ঘটনাটি একটি দিব্যদর্শনও হতে পারে যার সম্পর্ক ভবিষ্যতে ঘটতে চলা কোন ঘটনার সঙ্গে ছিল। অর্থাৎ আগুনে স্বভাবের,বিদ্রোহী মনোভাবের দুর্বৃত্তপরায়ন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শয়তানের স্বভাববিশিষ্ট মানুষ হুযুর (সা.) কে তাঁর কর্তব্যে বাধা দেওয়ার জন্য যুদ্ধের রূপে শত্রুতার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করবে এবং অবাধ্য ও একগুঁয়ে গোত্রগুলোকে তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই সব দুর্বৃত্তদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর অধীনস্ত করবেন এবং তারা এই আক্রমণ থেকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে এমনটাই হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁকে বিজয় ও সাহায্য দান করার মাধ্যমে ইফরিয়াত স্বভাববিশিষ্ট সেই সমস্ত শত্রুদের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। হযরত সুলেমান (আ.) ঐশী ইচ্ছানুসারে বিজীত জাতিগুলিকে দাসে পরিণত করেন যারা আমৃত্যু হযরত সুলেমান (আ.)-এর দাসত্ব করতে থাকে। কিন্তু হুযুর (সা.) ছিলেন মানবজাতির জন্য মূর্তমান দয়া ও করুণা ছিলেন। আর যেমনটি এই ঘটনার শেষাংশও থেকেও প্রমাণিত হয়, তিনি (সা.) দাসদের স্বাধীন করার শিক্ষা দেন আর তাঁর সাহাবাগণ লক্ষ লক্ষ দাসদের মুক্ত করে দেন।

এই ঘটনাটিকে যদি বাস্তব ঘটনা বলে ধরা হয় তবে এর থেকে প্রমাণ হয় যে, এক কুৎসিত, বীভৎস চেহারা বিশিষ্ট বন্য ও পশুস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি বা পশু রাত্রিবেলা হুযুর (সা.) উপর আক্রমণ করে যখন তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। যার ফলে তাঁর নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আঁ হযরত (সা.) সেই মানুষ

বা পশুটিকে নিজ বশে আনেন এবং মসজিদের স্তম্ভে বেঁধে রাখতে মনস্থির করেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাঁর স্বভাবজাত দয়া ও স্নেহ পরবশ হয়ে তাকে মুক্ত করে দেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নমল এর তফসীরে 'ইফরিয়াত' -এর আভিধানিক অর্থের আলোচনায় লেখেন- 'ইফরিয়াত এর অর্থ কোন কাজ সম্পাদনকারী, মন্দ এবং অপছন্দনীয়। (আকরব) এরপর এই আয়াতের তফসীরে হযরত সুলেমান (আ.) এবং রাণী সাবার ঘটনা বর্ণনা করে ইফরিয়াত সম্পর্কে তিনি লেখেন- হযরত সুলেমান (আ.) মনে করেন হুদহুদ এর আনা

আনা উপহার দিয়ে তো কিছু হল না। অন্য কিছু নিয়ে এস। এবং তিনি বললেন, হে আমার সর্দার! মানুষ আমার অনুগত হয়ে আসার পূর্বে রানীর সিংহাসন কে আমার কাছে নিয়ে আসবে? যারা বিশেষ দেহরক্ষী ছিল তাদের এক নেতা বলে উঠল, আপনার উপর আক্রমণের পূর্বে আমি সেই সিংহাসন নিয়ে আসব। যেহেতু সে সেনাপতি ছিল, তাই সে জানত যে সেনাবাহিনী এখানে কতদিন পর্যন্ত ঘাঁটি গেঁড়ে থাকবে। তাই সে অনুমান করে নেয় যে, এতদিনের মধ্যে রানীকে পরাস্ত করে সেই সিংহাসন নিয়ে আসা যেতে পারে আর সেই সঙ্গে দাবী করে যে, আমি একজন শক্তিশাল সর্দার আর ছোট্ট দেশটির সেনাবাহিনী আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারবে না। আর আমি আপনার অনুগতও বটে। এই সম্পদ নিয়ে আসার বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে কোনও প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা হবে না।

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

৩) আমাদের যুগটি শেষ যুগ কি না আর প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর এই যুগে আবির্ভুত হওয়ার প্রশ্নের উত্তরে বলব, কুরআন করীম, হাদীস এবং উম্মতের বুজুর্গদের উক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে আঁ হযরত (সা.) তাঁর উম্মতের মধ্যে যে মসীহ ও মাহদীর আগমণের সংবাদ দিয়েছিলেন তার আবির্ভাব কালের সময় নির্ধারিত ছিল হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন-

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

(আসসিজদা: ৬) এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এক হাজার বছর পর্যন্ত মুসলমানরা পৃথিবীতে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকবে। এরপর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলামের গৌরব ও মর্যাদাকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী প্রতিশ্রুত পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে এবং ইসলাম পুনরায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আঁ হুযুর (স.) ইসলামের প্রথম তিনটি শতাব্দীকে খাইরুল কুরুন অর্থাৎ সর্বোত্তম শতাব্দী নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই হাজার বছর যাতে ইসলাম আকাশে উঠে যাওয়া নির্ধারিত ছিল তা নিঃসন্দেহে এই তিন শতাব্দীর পরে শুরু হওয়ার ছিল। সুতরাং তেরোশ বছর পর দ্বীনে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল যা মাহদী ও মসীহর আবির্ভাবের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব ছিল। কেননা সুরা জুমআর আয়াত وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (আয়াত: ৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের ছাড়া অন্য একটি জাতিতেও প্রেরণ করবে যারা এখনও এদের (সাহাবাদের) সঙ্গে মিলিত হয় নি- এই আয়াতে সেই মসীহ ও মাহদীর আগমণকে আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (সা.) এর আগমণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর হুযুর (সা.) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে হযরত সালমান ফারসি (রা.) এর কাঁধে হাত রেখে বলেন, ঈমান যখন সপ্তর্ষিমণ্ডলে উঠে যাবে তখন পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা জুমআ)

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) পারস্য বংশীয় সেই ব্যক্তির আগমণকে নিজের আগমণ আখ্যায়িত করেছেন যার মাধ্যমে শেষ যুগে ঈমান পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাওয়া নির্ধারিত ছিল।

দিব্যদর্শনের অধিকারী এক বুজুর্গ হযরত নেয়ামোতুল্লাহ্ ওলী সাহেব (রাহে.) তাঁর প্রসিদ্ধ ফার্সি কাসিদায় শেষ যুগের অবস্থা বর্ণনা করে লেখেন- যখন 'গাইন' 'রে' (অর্থাৎ ১২০০ বছর) অতিক্রান্ত হবে সেই সময় আমি অদ্ভুত ঘটনাবলী প্রকাশ পেতে দেখছি। যুগের মাহদী এবং ঈসা উভয়কে আমি অশ্বারোহী অবস্থায় দেখছি।

(আল আরবাঈন ফি আহওয়ালুল মাহদীঈন, সংকলক মহম্মদ ইসমাঈল শহীদ, পৃ:২,৪)

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী (রাহে.) লেখেন-

عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ جَلَّ جَلَالُهٗ اَنَّ الْقِيَامَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ وَالْمَهْدِيُّ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوْجِ

অর্থাৎ খোদা তা'লা আমাকে বলেছেন, কিয়ামত নিকটে আর মাহদীর আবির্ভাবের সময় হয়েছে।

(আততাফহীমাতুল ইলাহিয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৩, তাফহীম নম্বর-১৪৭)

এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও একাধিক স্থানে এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যুক্তিপূর্ণ দলিল দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, এটিই সেই শেষ যুগ যাতে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সংশোধনের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণ নির্ধারিত ছিল। হুযুর (আ.) বলেন- "কুরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী আমাদের বিশ্বাস হলো, আদি থেকেই খোদা স্রষ্টা। তিনি চাইলে কোটি কোটি বার আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করে পুনরায় বানাতে পারেন এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী সকল সভ্যতার পর যে আদম (আ.) আগমন করেন, যিনি আমাদের সবার আদি পিতা- পৃথিবীতে তাঁর আগমনের যুগ থেকে বর্তমান মানব সভ্যতা সূচিত হয়েছে। আর এই সভ্যতার পূর্ণ চক্রের আয়ু সাত হাজার বছর পর্যন্ত প্রসারিত। এই সাত হাজার বছর আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের সাত দিনের মত। স্মরণ রাখতে হবে, ঐশী বিধান প্রত্যেক সভ্যতার জন্য সাত হাজার বছরের চক্র ধার্য করেছে। এই চক্রের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে সাতটি দিন ধার্য করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, আদম সন্তানদের সভ্যতার আয়ু সাত হাজার বছর ধার্যকৃত রয়েছে। আর নির্ধারিত এই সময়ের মধ্য থেকে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর যুগে প্রায় পাঁচ হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, খোদার দিনগুলোর মধ্য থেকে [তাঁর (সা.) যুগ পর্যন্ত] প্রায় পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। সূরাতুল আসর-এ অর্থাৎ এর বর্ণমালার গাণিতিক মানের (আবজাদের) গণনানুযায়ী কুরআন শরীফে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয় তখন আদমের যুগ থেকে তত সময় অতিবাহিত হয়েছিল যা উল্লেখিত সূরার আবজাদের সংখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান। এই হিসাব অনুযায়ী মানবজাতির আয়ুর মধ্যে এখন এ যুগে ছয় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং এক হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। কুরআন শরীফেই নয় বরং তার পূর্বে অবতীর্ণ বেশিরভাগ গ্রন্থেই লিখিত আছে, সেই সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ যে আদমের রূপে আবির্ভূত হবে আর যাঁকে মসীহ্ নামে সম্বোধন করা হবে- তাঁর জন্য 'ষষ্ঠ হাজার'- এর শেষাংশে জন্ম নেয়া আবশ্যক, যেমন আদম ষষ্ঠ দিনের শেষাংশে জন্ম নিয়েছিলেন। এই সমস্ত নিদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের আলোকে উক্ত সাত হাজার বছরের বন্টন হলোঃ 'প্রথম সহস্র' পুণ্য ও হেদায়াত বিস্তারের যুগ আর দ্বিতীয় সহস্র শয়তানের আধিপত্যের যুগ। অতঃপর তৃতীয় সহস্র নেকী ও হেদায়াত প্রসারের পালা। পুনরায় চতুর্থ সহস্র শয়তানের আধিপত্যের সময়। এরপর পঞ্চম সহস্র পুণ্য এবং হেদায়াত বিস্তৃতির [এটাই সেই সহস্র যার মধ্যে আমাদের নেতা ও অভিভাবক, সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন এবং শয়তানকে বন্দী করা হয়]। এবং পুনরায় ষষ্ঠ সহস্র শয়তানের মুক্তি এবং আধিপত্যের যুগ যা তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর পর থেকে আরম্ভ হয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এসে শেষ হয়। এরপর সপ্তম সহস্র- যা খোদা এবং তাঁর মসীহ্‌র জন্য নির্ধারিত। এটা সব ধরনের কল্যাণ, প্রাচুর্য, ঈমান, শান্তি, তাকওয়া, তওহীদ, খোদা-ভক্তি এবং সব ধরনের পুণ্য ও হেদায়েতের যুগ। বর্তমানে আমাদের অবস্থান সপ্তম সহস্রের শিরোভাগে। এরপর দ্বিতীয় কোন মসীহ্‌র আগমনের সুযোগ নেই। কেননা, যুগ সাতটি যা পাপ আর পুণ্যে বিভক্ত। আর সব নবী যুগের এই বিভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ রূপকভাবে আর কেউবা বিস্তারিতভাবে। আর এই বিবরণ কুরআন শরীফে বিদ্যমান, যা দ্বারা কুরআন শরীফ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। এবং এটা অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত নবী তাদের গ্রন্থে কোন না কোনভাবে মসীহ্‌র যুগের সংবাদ দিয়েছেন এবং দাজ্জালের ফেতনা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যদ্বাণী এই ভবিষ্যদ্বাণীর মত এমন গুরুত্ব ও ধারাবাহিকতার সাথে পাওয়া যায় না- যেভাবে সব নবী শেষ মসীহ্ সম্বন্ধে করে গেছেন। (শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

শেষের পাতার পর.....

সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ধনী দেশ। তারা কেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বার্মার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো না? শুধু হাদীসে পড়ে যে, মুসলমানরা পরস্পর ভাইভাই। যদি দেশগুলির শক্তি থাকে তবে কেন তারা সেই হাতকে প্রতিহত করছে না? আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, যদি তোমরা কোন অসৎ কাজ হতে দেখ, তবে হাত দ্বারা প্রতিহত কর। যদি শক্তি না থাকে তবে মুখ দিয়ে প্রতিহত কর। আর সেই শক্তিও না থাকলে তার জন্য অন্তত দোয়াই কর। আপাতত আমাদের হাতে কোন রাষ্ট্রক্ষমতাও নেই, আর অর্থবলও নেই। তাই আমরা তাদের জন্য দোয়াই করতে পারি যে, হে আল্লাহ্ এই নির্যাতিতদের উপর তুমি দয়া কর। কিন্তু যে সব দেশের হাতে সম্পদ আছে আর ক্ষমতাও আছে যেগুলির মোট সংখ্যা ৫৪টি, যা অর্ধেক বিশ্ব জুড়ে আছে, তারা কেন সকলে মিলে বার্মাকে বাধা দিল না? এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, এখানে অত্যাচার হচ্ছে মুসলমানের উপর, কিন্তু সেটা শাস্তি কি না তা আল্লাহই ভাল জানেন। তাদের আমল কি ছিল সেটা আল্লাহ্ ভাল জানেন। কোন কাজের জন্য তারা শাস্তি পাচ্ছে না কি সত্যিই তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তবে তো অত্যাচারিতদের সাহায্য করা উচিত। মুসলমানরা কেন সাহায্য করছে না? যদি তারা নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য না করে তবে তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির কবলে পড়বে। তাই অনেক ইসতেগফার করা উচিত।

এই যে বর্তমান খিলাফত রয়েছে যা ইমাম মাহদীর আগমণের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া নির্ধারিত ছিল সেটি হল আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় খিলাফত। জাগতিক বিষয়াদির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

'সম্রাটগণ তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবেন।' এর অর্থ হল, তোমার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর জাগতিক সম্রাট তোমার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবেন।

জাগতিক রাজত্ব যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তাদের জন্য নির্দেশ হল তাদের মধ্যে মীমাংস কর কিন্তু যতদূর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উন্নতির প্রশ্ন, সেটা খিলাফতের মাধ্যমে হবে। কিম্বা মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে হবে। বিভিন্ন রাজ্যের বাদশাহ থাকবে, ইসলামী সাম্রাজ্যেরও হবে, তারা আধ্যাত্মিকভাবেও পথনির্দেশনা নিতে থাকবে আর হতে পারে অন্যান্য কিছু বিষয়েও যুগ খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিতে থাকবে,

নও মোবাঈনদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) অন-লাইন সাক্ষাতানুষ্ঠান

২০২১ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) নো-মোবাঈন মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া কানাডার সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন। অপরদিকে নুর টাউন ভিলেজে আইওয়ানে তাহের হল থেকে ২০ জন নও মোবাঈন অনলাইনে অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নওমোবাঈনদের সঙ্গে পরিচয় করেন এবং তাদের কাছে আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা শোনেন।

হুযুর আনোয়ার একজন নোমোবাঈন খাদিম জনাব টনি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এবং কেন করেছেন? তিনি বলেন, আমি জুলাই মাসে বয়আত করেছিলাম। সেই সময় জীবনের কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম। আর আমার সঙ্গে একজন সহকর্মী ছিলেন যে সেই সময় আমার দেখাশোনা করত। হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে টনি সাহেব বলেন, তিনি ইসলামের বিষয়ে আরও বেশি শেখার চেষ্টা করছেন। হুযুর আনোয়ার একথা শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এক নওমোবাঈন নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে বলেন তার নাম মহম্মদ মোহদা মুজাদ, তিনি কানাডা থেকে এসেছেন, কিন্তু পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত। তিনি আরও বলেন, তিনি তার পরিবারের প্রথম আহমদী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কেবল আল্লাহ্ই সহায়।

হুযুর আনোয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি বয়আত করে কেন নিজেকে সমস্যার মধ্যে ফেলেছেন?

তিনি উত্তর দেন, সকলকে মরতে হবে। আর আমার আশঙ্কা ছিল যে আমি মারা গেলে আমার কি হবে। কেউ আমাকে একটা পথ দেখায় যে, সেই ইমাম মাহদী এসে গিয়েছেন যার অপেক্ষা সুন্নী সম্প্রদায় এখনও করে চলেছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি জামাতের অনেক বই-পুস্তক পড়ি আর এর পর আমার মনে হয় যে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। তাই আমি বয়আত করে নিই।

ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারের কাছে নিজের পরিবার, বিশেষ করে তার মায়ের জন্য দোয়ার আবেদন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন।

সারগিউ নামে আরও এক নওমোবাইন সাহেব বলেন, তিনি ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে আমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'সেই সময় আমি এক দিকভ্রান্ত আত্মা ছিলাম আর আমার জন্য কোনও জামাতের অংশ হওয়ার তাগিদ ছিল। এখানে আমি কয়েকটি জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। এর পরিবেশ এবং অভ্যর্থনাকারীরা খুব ভালভাবে আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, তিনি কি এর আগে খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, জ্বি হুযুর! এরপর হুযুর আনোয়ার তার কাছে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি সেখানে এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয় যিনি পর পর দু'বছর আমাকে জলসা সালানায় আমন্ত্রিত করেন। একটি ছিল ২০১৬ সালের জলসা যখন আপনি এসেছিলেন এবং সেখানে যে স্লোগান ছিল Love for all hatred for none তা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তাই আমি এমন জামাতের অংশ হতে চাইতাম যা অন্যান জামাতের জন্যও আদর্শ হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, বেশ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিজ কৃপারাজির অধিকারী করুন।

এরপর মার্ক নামে এক নওমোবাইনকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আহমদীয়াত কেন গ্রহণ করেছেন? তিনি বলেন, যখন তিনি ফিলিপাইন এ ছিলেন,তখন তিনি ধর্মের বিষয়ে অনেক গবেষণা করেন। কেননা খৃষ্টধর্মের বিষয়ে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি যখন কানাডা আসি তখন আমার সহকর্মী আমাকে আহমদীয়াতের সঙ্গে পরিচয় করায় এবং তাঁর সঙ্গে আমার এনিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হতে থাকে। এরপর ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি।

সাদাত নামে আরও একজন নওমোবাইন বলেন, তিনি ২০২০ সালের রমযান মাসে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি আহমদীয়াত কেন গ্রহণ করেছেন– হুযুর আনোয়ারে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিনি গত পনেরো বছর থেকে তিনি কয়েকজন আহমদী বন্ধুদের সংস্পর্শে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার তাঁর বয়স জানতে চাইলে তিনি জানান তাঁর বয়স ৩৫ বছর। হুযুর আনোয়ার বলেন, অর্ধেক জীবন আপনি তর্কবিতর্কে কাটিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক বলেন, প্রথম দিকে নাস্তিকতার প্রতি আমার ঝোঁক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আমার কিছু বন্ধু আমাকে একথা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, আমি ভুল পথে চালিত হচ্ছি আর আমার যুক্তিও একথা (নাস্তিকতা) মেনে পারছিল না। ইসলামের কথা সঠিক বলে মনে হত ঠিকই, কিন্তু ইসলামের অন্যান্য রূপগুলি যখন চোখে পড়ত..... হুযুর বলেন, ইসলামের কথা সঠিক বলে মনে হত কিন্তু এর শিক্ষার বাস্তবায়ন চোখে পড়ত না। তিনি বলেন, একদম তাই।

এরপর তিনি বলেন, এরপর মালেয়েশিয়ায় এক আহমদী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয় যাঁকে আমি ইসলামের শিক্ষাকে নিজের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে দেখেছি। অ-আহমদীরা তাঁর সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে এলে তিনি খুব ভালভাবে তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন এবং তাঁর যুক্তিগুলিও যথাযথ বলে মনে হত। অন্যদের কথা বুঝতেও পারতাম না। এরপর আমি যখন কানাডা এলাম, তখন পুনরায় কিছুটা নাস্তিকতার দিকে ফিরে যাই। কিন্তু এরপরও আমার মনে হত এটা সঠিক পথ নয়। এরপর আমি ক্যালগেরিতে মুরুব্বী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করি, তাঁর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করি। আর গত রমযান মাসে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কেননা তখন কোভিড চলছিল আর আর আমার মনে হয়, না, আর নয়, এখন আমাকে সঠিক পথ বেছে নিতে হবে। আর আমর ভয় কিসের? সুতরাং আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ॥

এক নওমোবাইন বলেন, 'আমার নাম কেবল গান্ধী আর আমার সম্পর্ক ভারতের সঙ্গে। এছাড়া আমি সুইজারল্যাণ্ডে থেকেছি। ২০১৮ সাল থেকে কানাডায় বাস করছি। আমি গত পরশু আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। হুযুর আনোয়ার মৃদ্যু হেসে বলেন, সদ্যই জন্ম নিয়েছেন। বেশ। তিনি আরও বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আমি নাস্তিক ছিলাম। আমি কোন ধরণের খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু একথা অবশ্যই বিশ্বাস করতাম যে, একটি শক্তি রয়েছে যা এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এরপর ২০১৮ সালে আমি আমার মাস্টার কোর্স করার জন্য কানাডা আসি। আমার প্রফেসর একজন আহমদী ডাক্তার ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, প্রত্যেকটি বস্তু একটি শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যাঁকে আমরা খোদা বলি। আমার কিছু দ্বিধা ও সংশয় ছিল। কেননা, আমি মনে করতাম যে, বিজ্ঞান থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। এরপর বিশদ গবেষণা করার পর আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, খোদা আছেন আর আমি এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান আনি। আর ইসলামও একথাই বলে যে, খোদা এক-অদ্বিতীয়। এরপর বিশেষ করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হই। কেননা অন্যান্য সকল ধর্ম (এর মানুষ) এমন যারা নিজেদের ধর্মের রক্ষার জন্য অপরের প্রাণ হরণ করতে পারে। হুযুর আনোয়ার তাকে সংশোধন করে বলেন, অন্যান্য ধর্ম অকারণে অপরকে হত্যা করতে পারে এমনটা নয়, বরং তারা হত্যা করে।' তিনি বলেন, আর আহমদীয়াত যদিও ইসলামেরই একটি অংশ এবং অহিংসবাদী মতবাদে বিশ্বাসী। আর আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর শান্তির জন্য ভবিষ্যতের জন্য এটিই একমাত্র পথ। এই জন্য আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দান করুন।

অপর এক নওমোবাঈ বলেন, 'আমার নাম অউব্রে বেকার আর তিন মাস পূর্বে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। আমার সম্পর্ক করাচি পাকিস্তানের সঙ্গে। আমার বয়স যখন দুই বছর, তখন আমরা আবুধাবি স্থানান্তরিত হই। এক ক্যাথলিক পরিবারে আমার বেড়ে ওঠা। ক্যাথলিক চার্চ ভালবাসা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 22 June, 2023 Issue No.25

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

উপর অনেক জোর দেয়। এছাড়া আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছি সেখানকার 'নান' এবং প্রিস্ট' এর আমল তাদের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। ২০০৫ সালে আমার পরিবার খৃষ্টবাদেরই অপর এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তবু আমার মন আশ্বস্ত হয় নি। ২০১৫ সালে সমস্ত বিষয় থেকে আমার ঈমান হারিয়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর পর বেশ কয়েকজন আহমদী বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে আমি অনেক ভালবাসা, আন্তরিকতা পাই; ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে- এর প্রকৃত নমুনা আমি আপনাদের জামাতের মধ্যেই দেখতে পেয়েছি। এই কারণেই আমি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ॥ খুব ভাল। তার মানে আপনি বন্ধুদের মধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন?' তিনি বলেন, 'জ্বি হুযুর! গত বছর বয়আত গ্রহণ করেছি আর বন্ধুর বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়েছে।' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মাশাআল্লাহ্'। তার মানে আপনি এখনও অবিবাহিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সম্পর্ক কল্যাণমণ্ডিত করুন।

আর এক নওমোবাঈ বলেন, 'আমার নাম হুমাউন আর ২০১৯ সালের শেষের দিকে আমি বয়আত গ্রহণ করি। আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন আছে। ইসলামের যে খিলাফত রয়েছে আর এতে খলীফার যে মর্যাদা রয়েছে তা ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই যে বর্তমান খিলাফত রয়েছে যা ইমাম মাহদীর আগমণের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া নির্ধারিত ছিল সেটি হল আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় খিলাফত। জাগতিক বিষয়াদির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতীতেও কিছু আম্বিয়া এসেছেন যারা জাগতিক রাজত্বের অধিকারী হয়েছেন আর কিছু এমন নবী এসেছেন যাদের কোন রাজত্ব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.) কোনও রাজত্ব লাভ করেন নি, কিন্তু তিনি খৃষ্টানদের বাদশাহ তথা নবী ছিলেন। তিনশ দশ বছর পর যখন রোমান বাদশাহ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তার পর থেকেই খৃষ্টধর্মের খোলাখুলি প্রচার শুরু হয় এবং তার বিস্তার ঘটে। আর আহমদীয়া খিলাফত অবশ্যই একটি আধ্যাত্মিক খিলাফত। তবে এই খিলাফতে বাদশাহ বা রাষ্ট্রনেতারা আহমদীয়াত তথা ইসলাম গ্রহণ করবেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছেন- 'সম্রাটগণ তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবেন।' এর অর্থ হল, তোমার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর জাগতিক সম্রাট তোমার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবেন। অনুরূপভাবে কুরআন করীমে সূরা হুজরাতে বর্ণিত আছে, যখন দুটি মুসলমান দল ও রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তাদের যে অন্যান্য প্রতিবেশী রয়েছে তারা যেন তাদেরকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করে, অত্যাচারীর হাত প্রতিহত করে। আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মীমাংসা করার সময় কারো উপর যেন অবিচার না করা হয়। নিঃসন্দেহে একটি রাজ্যের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়েছে, তবুও যেন তার উপর জুলুম না করা হয়। মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর শান্তিতে থাক আর যদি পুনরায় আক্রমণ করে তবে সকলে মিলে তাকে প্রতিহত কর। যে সময় কুরআন করীম নাযেল হয় তখন একটি মাত্র মুসলমান রাজত্ব ছিল। সেখানে তো দুটি রাজত্বের বা দুটি জামাতের প্রশ্নই ছিল না। এর অর্থ হল, জাগতিক রাজত্ব যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তাদের জন্য নির্দেশ হল তাদের মধ্যে মীমাংস কর কিন্তু যতদূর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উন্নতির প্রশ্ন, সেটা খিলাফতের মাধ্যমে হবে। কিম্বা মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে হবে। এটা প্রমাণিত যে, এখন যে যুগ অতিক্রান্ত হচ্ছে এতে খিলাফতের সম্পর্ক কেবল আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের সঙ্গে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের বাদশাহ থাকবে, ইসলামী সাম্রাজ্যেরও হবে, তারা আধ্যত্মিকভাবেও পথনির্দেশনা নিতে থাকবে আর হতে পারে অন্যান্য কিছু বিষয়েও যুগ খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিতে থাকবে, কিন্তু এখন জাগতিক রাজত্ব খিলাফতের হাতে নেই। তবে জাগতিক সাম্রাজ্য আধ্যাত্মিকভাবে অবশ্যই খিলাফতের অধীনস্ত।

এরপর তিনি আরও একটি ছোট্ট প্রশ্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আর অনুমতি পাওয়ার প্রশ্ন করেন যে, সমগ্র জগতে যে সব মূলধারা মুসলমান রয়েছে জামাত আহমদীয়ার দৃষ্টিতে তাদের কি মর্যাদা রয়েছে? আর সারা বিশ্বে তাদের সঙ্গে যে সব আচরণ হচ্ছে সেগুলি তাদের উপর আযাব নাকি তাদের উপর অত্যাচার ও অবিচার হচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা ছোট প্রশ্ন তো কোনভাবেই নয়, অনেক বড় প্রশ্ন। প্রশ্ন ছোট, তবে উত্তর অনেক বড়। আসল কথা হল, যারা মূলধারার মুসলমান, তাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি বলে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। সে মুসলমান। যে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে, আমরা তো তাকে মুসলমানই বলে থাকি। তবে যে যুগের ইমাম ও প্রতিশ্রুত মসীহকে অস্বীকারকারী, এই দিক থেকে আমরা তাদেরকে বলি, তোমরা অস্বীকারকারী। তারা মসীহ মওউদ এর অস্বীকারকারী, সেই মসীহ্র অস্বীকারকারী যার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) করেছিলেন এবং সূরা জুমআয় ও অন্যান্য স্থানেও কুরআন করীম যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অস্বীকারকারী। কিন্তু কলেমা পাঠকারী হিসেবে যেখানে ইসলামের এক ব্যাপক পরিভাষা রয়েছে, সেই পরিভাষা অনুসারে তারা অবশ্যই মুসলমান। আমরা তাদেরকে অমুসলিম বলতে পারি না। কেননা আর যাইহোক, তারা আঁ হযরত (সা.)-এর মান্যকারী।

দ্বিতীয়ত, তাদের সঙ্গে যা কিছু হচ্ছে তার বাস্তবতা কি? আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, যখন মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করবেন এবং তারা জয়ী হবে। এটাই ছিল প্রতিশ্রুতি, অন্তত ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি। খিলাফতে রাশেদার যুগে এই দৃশ্যই দেখেছি। বর্তমানে আমি বদরী সাহাবীদের বিষয়ে খুতবা দিচ্ছি। তাদের মধ্যে খলীফাদের বর্ণনা চলছে, হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছে। তাঁর খিলাফতকালেই সব থেকে বেশি জয়লাভ হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, কিভাবে বড় সাম্রাজ্যগুলি ইসলামী সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, মুসলমানেরা যদি আল্লাহ্ তা'লার খাতির যুদ্ধ করে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের জয়লাভ হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। এটা হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, মুসলমানেরা এখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ করছে। কোনও একটি স্থানেও দেখিয়ে দিন - ব্যতিক্রম ফিলিস্তীন যেখানে তারা ইসরাঈল তথা ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে- ..... এছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে যে অরাজকতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে তা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেই, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, এক রাজনৈতিক দল অপর দলের বিরুদ্ধে। তালিবান ঘোষণা দিয়েছে, 'আমরা মক্কা বিজয় করে ফেলেছি'। কিসের মক্কা বিজয়? সেখানে কি কোন কাফের ছিল যাদের বিরুদ্ধে তারা জ য়লাভ করেছে? তারাও তো মুসলমান ছিল, যারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করত, তালিবানও সেই একই কলেমা পাঠ করে। তাই কোন্ দিক থেকে এটা মক্কা বিজয় হল? এখানে তো মুসলমান অপর মুসলমান হত্যা করছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তাদেরকে শাস্তি দান করব। কুরআন শরীফে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আঁ হযরত (সা.) এর এক সাহাবী যুদ্ধক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসেন, যে কিনা তরবারির ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। এরপর আঁ হযরত (সা.)এর কাছে এর সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। সেই সাহাবী বলেন, সে তরবারির ভয়ে কলেমা পড়েছিল। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে মৃত্যু ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। তাই একজন মুসলমান যেন অপর এক মুসলমানকে হত্যা না কারে, সে বিষয়ে এই সীমা পর্যন্ত কঠোরতা রয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও এরা যদি এমনটি করে থাকে, তবে এদের বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার আমার কি প্রয়োজন? স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কর্মফল প্রকাশ করে দিচ্ছেন- এটা তাদের উপর শাস্তি , নাকি তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট আছেন? আপনি নিজেই এর বিচার করতে পারেন। বরং আল্লাহ্ তা'লা নিজেই এর যে কর্মগত সাক্ষী পেশ করেছেন যে এর বাস্তবতা কি। এ বিষয়ে আমার আর নিজস্ব কোন মতামত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

তিনি আরও প্রশ্ন করেন যে, বার্মাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, এছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে একই কাজ হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি মুসলমানদের মধ্যে একতা থাকত- ৫৪টি দেশ আছে মুসলমানদের আর, আর

(শেষাংশ ১০ পাতায়.....)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir